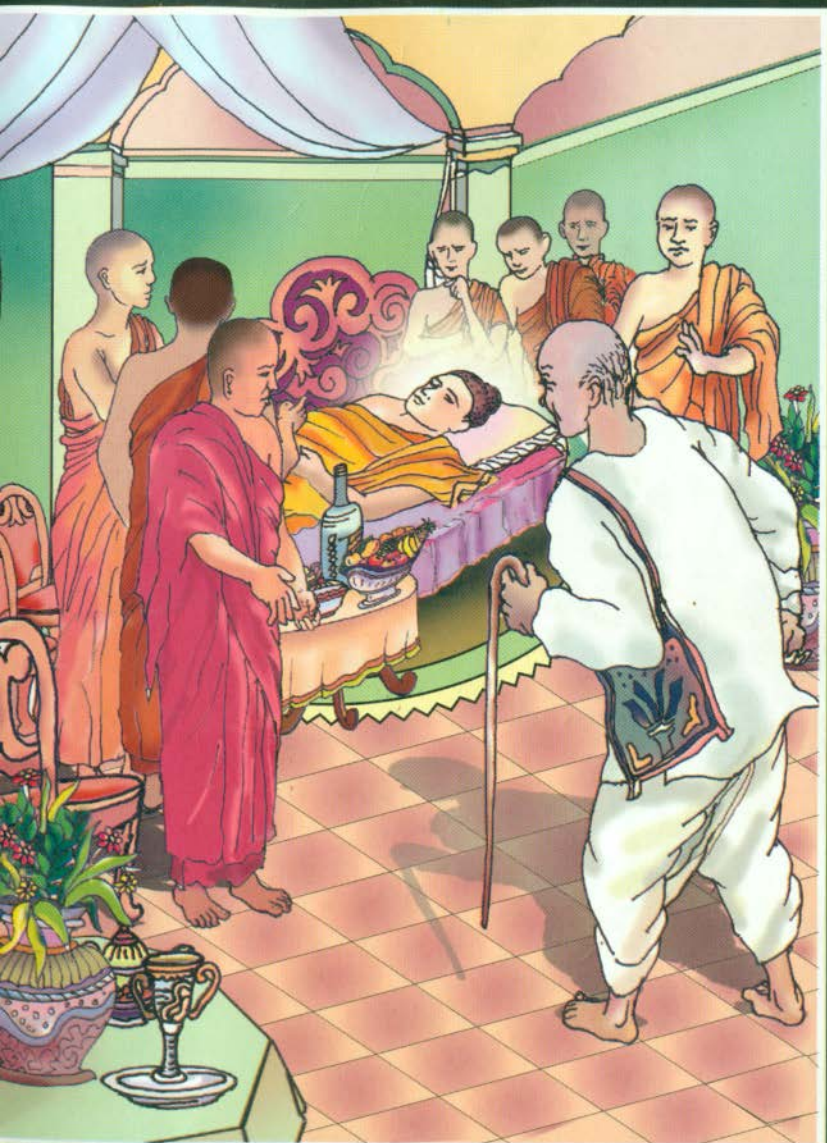


জীবক



শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

জীবক

শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির

১ম প্রকাশ : ফাল্গুনী পূর্ণিমা ২৫০৮ বুদ্ধবর্ষ, ২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ ১৯৬৫ খ্রিঃ

২য় সংস্করণ : প্রবারণা পূর্ণিমা ২৫৫২ বুদ্ধবর্ষ, ১৪১৫ বাংলা, ২০০৮ খ্রিঃ

প্রকাশক : পংকজ বড়ুয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী
মহাদিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

কৃতজ্ঞতায় : লায়ন আদর্শ কুমার বড়ুয়া, এমজেএফ
মহাসচিব, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি।

তত্ত্বাবধানে : অসীম কুমার বড়ুয়া, সমাজসেবা অধিদপ্তর

সহযোগিতায় : শ্রীমৎ শক্তিমান শ্রমণ, দঃ হাসিমপুর বিজয়ারাম বিহার, চন্দনাইশ।
সাংবাদিক কাঞ্চন বড়ুয়া, আজকের সূর্যোদয়
সাংবাদিক বিপুল বড়ুয়া, দৈনিক আজাদী
পুতুল বড়ুয়া, সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস, চট্টগ্রাম।
নিপু কাণ্ডি বড়ুয়া, ডায়মন্ড ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী

প্রচ্ছদ : চিত্রশিল্পী অধ্যাপক উত্তম বড়ুয়া

শব্দবিন্যাস : সাগরিকা কম্পিউটার্স

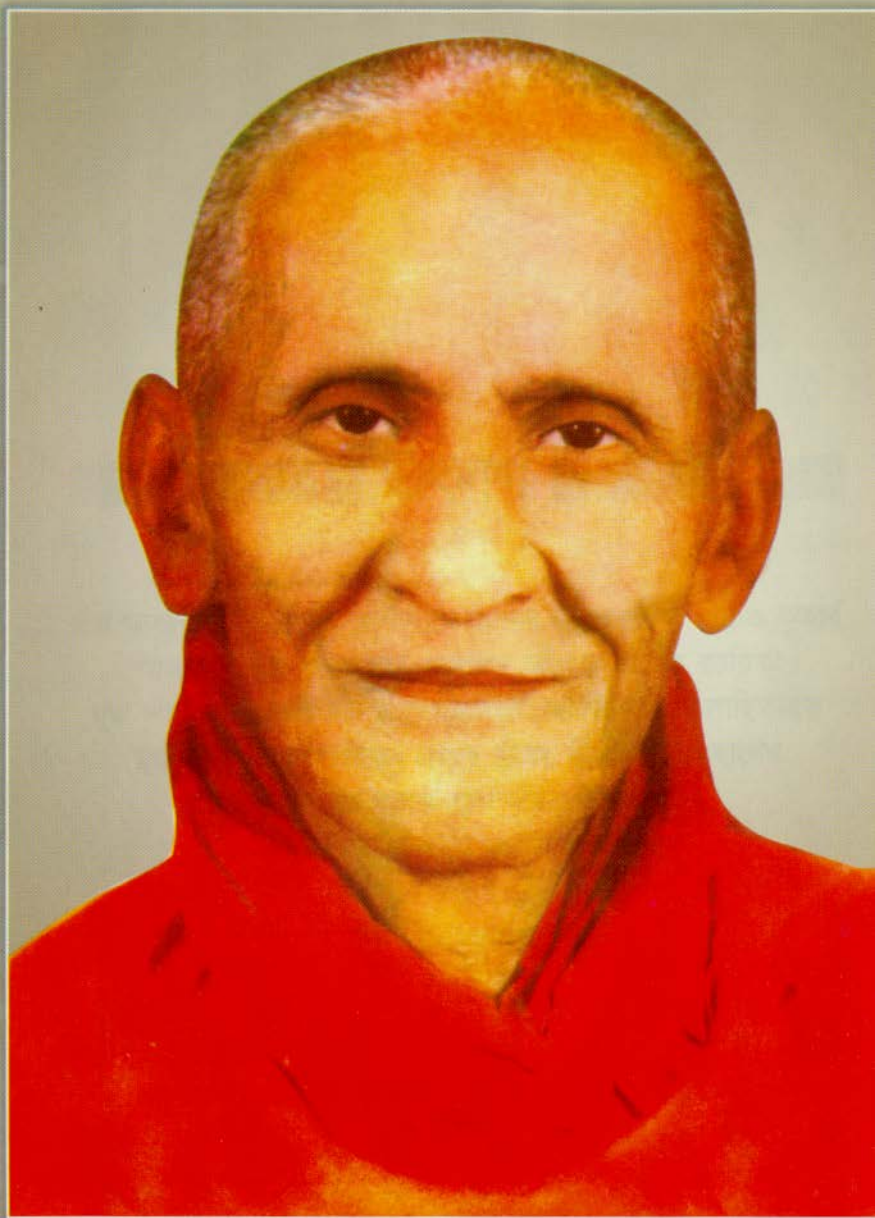
মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে : ইন্টারস্পেস কমিউনিকেশন্স

কদম মোবারক এতিমখানা এনেঞ্জ ভবন (২য় তলা)
৪০, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬৩১৮৫৫, ২৮৬০৪৮৫
ই-মেইল: interspace.shyamol@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান : _____

- চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধ মন্দির সড়ক, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম।
- মহাদিয়া জ্ঞানবিকাশ বিহার, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
- বান্দরবান সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার, বালাঘাটা, বান্দরবান।

বিক্রয়ের জন্য নহে, বিনামূল্যে বিতরণের জন্য



অষ্টম সংঘরাজ শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির

জন্ম : ২১ জুন ১৯০০ খ্রিঃ □ উপসম্পদা : ১৯২১ খ্রিঃ □ মহাপ্রয়াণ : ২৩ মার্চ ২০০০ খ্রিঃ

উৎসর্গ

যাঁর অনাবিল অপত্যস্নেহ আশীর্বাদে আমার জীবন সতত ধন্য ও কৃতার্থ
আমার শ্রদ্ধেয় পরমারাধ্য গুরুদেব 'জীবক' গ্রন্থের রচয়িতা
বুদ্ধ শাসনের ধ্বজাধারী অগ্গমহাসন্ধর্মজ্যোতিকাধ্বজ সাহিত্যরত্ন
মহামান্য অষ্টম সংঘরাজ প্রয়াত শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাধের
মহোদয়ের অনন্ত পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে
এই গ্রন্থটি পুনরায় প্রকাশিত হলো।

বিনীত-প্রকাশক

‘জীবক’ গ্রন্থের রচয়িতা
সাহিত্যরত্ন মহামান্য অষ্টম সংঘরাজ
শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুন শুক্রবার চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত নানুপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ পরিবারে সংঘরাজ শীলালঙ্কার এর জন্ম। তাঁর গৃহী নাম সহদেব, পিতা জয়ধন বড়ুয়া (সওদাগর), মাতা শ্যামাবতী বড়ুয়া। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষাজীবন শুরু করে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ শেষে কৃতিত্বের সাথে চট্টগ্রাম শহরস্থ জে.এম.সেন উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন।

১৯১৯ সালে অধ্যাপক সমন পুন্নানন্দ স্বামীর “রত্নমালা” গ্রন্থ পাঠ এবং রাঙ্গুনিয়ার শিলকের ধর্মপালের সান্নিধ্য লাভে ব্রহ্মচর্য জীবনের প্রতি প্রবল প্রতীতি জন্মে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তদীয় গুরুদেব প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের নির্দেশে আরাকানিজ পণ্ডিত ভিক্ষু ড. সুমঙ্গলের নিকট প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হন, তখন তাঁর নামকরণ হল শ্রামণ শীলালঙ্কার। অধ্যক্ষ উঃ তেজারাম মহাস্থবিরের উপাধ্যায়াত্বে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভের পর বুদ্ধের ধর্ম ও বিনয় শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ বেড়ে যায়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ শিক্ষার্থে শ্রীলংকা গমন, একই সালে শ্রীলংকার সদ্ধর্মোদয় পরিবেশে মহাপণ্ডিত অধিনায়ক ভদন্ত উপসেন মহাস্থবিরের উপাধ্যায়াত্বে দ্বিতীয়বার কর্মবাক্য শ্রবণ করে পবিত্র ভিক্ষু পরিবাসব্রত গ্রহণ করেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মহাপণ্ডিত উপসেন মহাস্থবিরের শিষ্য পণ্ডিত ধর্মদর্শী মহাস্থবিরের নিকট ধর্ম শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে গুরুদেব প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের আহবানে রেংগুন গমন, “রেংগুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস” এবং “সংঘশক্তি” পত্রিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরসহ প্রতিষ্ঠা করেন “ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড”। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা কর্তৃক “সাহিত্যরত্ন” উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভায় অধিবেশনে তাঁকে “অনুনায়েক” পদে বরিত করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচার ও আক্রমণকালীন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য লোকদের বৌদ্ধ জাতির পরিচয়ে সনদপত্র প্রদান এবং

বিহারে আশ্রয় দিয়ে অনেকের জীবন রক্ষার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা তাঁকে সর্বোচ্চ পদমর্যাদায় ‘সংঘরাজ’ এবং মহাসভার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত করেন, সে সময়ে বৌদ্ধ জনসাধারণ ও আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংস্থা কর্তৃক তাঁকে “সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু” অভিধায় ভূষিত করেন। তিনি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে এশিয়া শান্তি সংস্থা বাংলাদেশ শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে শাসন ও সেবক সংঘ এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে মহামুণি মহানন্দ সংঘরাজ বিহারে প্রজ্জালোক-জিনবংশ কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক সারমেধ-গুণালংকার “স্বর্ণপদকে” ভূষিত, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ ছাত্র সংসদ কর্তৃক গুণীজন সংবর্ধনা হিসেবে সম্মানিত, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মায়ানমার সরকার কর্তৃক “অগ্গমহাসদ্বর্মজ্যোতিকাধ্বজ” উপাধি প্রাপ্ত এবং ২০০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ ভিক্ষু মহাসভা কর্তৃক “অগ্গমহাপণ্ডিত” উপাধিতে ভূষিত হন।

অষ্টম সংঘরাজ সাহিত্যরত্ন প্রয়াত শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির, রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ, রাহুল চরিত-১৯৩০ ইং, ধর্মপদ অট্টকথা-১৯৩১ইং, বুদ্ধযুগে বৌদ্ধনারী-১৯৩৩ ইং, অজাতশত্রু-১৯৩৪ইং, পারাজিকা-১৯৩৭ইং, বিমান বথু-১৯৩৮ ইং, বিশাখা-১৯৬৪ ইং, জীবক-১৯৬৫ ইং, বৌদ্ধ নীতি মঞ্জুরী-১৯৬৫ ইং, আনন্দ-১৯৬৬ ইং, জাতকাবলী-১৯৬৮ ইং।

এই মহান পণ্ডিতব্যক্তিত্ব ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ বিকাল ২.০৫ মিনিটে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলাস্থ মির্জাপুর শান্তিধাম বিহারে মহাপ্রয়াণ করেন।

পূর্বপত্র

মানবসভ্যতার ইতিহাসে বৌদ্ধযুগ সাহিত্যে-শিল্পে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে-ধর্মনীতিতে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে-সেবাস্বার্থে এবং সর্বোপরি মানবতাবোধ-বিকাশে স্বর্ণাঙ্করে প্রোজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে। জীবনচর্যার এমন কোন বিভাগ বা অধ্যায় নেই, যেখানে বৌদ্ধ-প্রতিভার মঙ্গলস্পর্শে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়নি। প্রাচীন বৌদ্ধগণ গণতন্ত্রের জন্মদান করেছিলেন বৈশালী-রাজ্যে, মল্লরাষ্ট্রে, গান্ধাররাজ্যে; সাহিত্যে, ব্যাকরণে, শাস্ত্র-বিশ্লেষণে ও ভাষা-প্রবর্তনে বিপ্লব এনেছিলেন অশ্বঘোষ, শীলভদ্র, চন্দ্রগোমী, সিদ্ধাচার্যগণ ও পুরুষোত্তমদেব; শিল্প-সৃজনে বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন অজন্তা, ভারহুত, কানহেরি ও গুহামন্দিরসমূহের ভিক্ষুশ্রমণ-ভাস্করগণ; সেবাস্বার্থে অতুলনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন সে-যুগের বুদ্ধ-শ্রাবকসংঘ; চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তর আনয়ন করেছিলেন বুদ্ধযুগ-ধন্বন্তরি “জীবক”। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত আয়ুর্বেদাচার্যগণ ছিলেন ভ্যিকসূর্য জীবকের উত্তরসূরি এবং জীবকের নিকট বহুলাংশে ঋণী।

মানুষকে মানুষরূপে মর্যাদাদানের যে পরাকাষ্ঠা বৌদ্ধযুগীয় সমাজব্যবস্থায় দেখা যায়, তা তুলনারহিত। অভয়কুমার ও জীবকের জন্মবৃত্তান্ত এবং জীবন-মর্যাদাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আম্রপালী, শালবতী, শ্রীমা প্রভৃতি নগরোর্বশী জনপদকল্যাণীগণ রাষ্ট্রবিধানে গণিকাবৃত্তিতে নিয়োজিত হলেও তাঁরা যে জ্ঞানে-গরিমায়, মাতৃত্ব-মহিমায় এবং স্বদেশ ও সদ্ধর্মহিতৈষণায় প্রকৃতই জনপদকল্যাণী ছিলেন, এবিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নেই। তাঁদের অপরিসীম মমতা মৈত্রীপূর্ণ চিন্তা, অপরিমেয় ধর্মচেতনা এবং কপর্দক-নিঃশেষ দান-উৎসর্গ যে-কোন সন্দিহান ব্যক্তির সকল সন্দেহ নিরসন করে। তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ও মূল্যবোধ কোন রাজমহিষীর প্রাপ্তব্য মর্যাদা ও মূল্যবোধ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলনা। আধুনিক যুগে জাপানের গীইসা-রমণীদের জীবনবৃত্তি পর্যালোচনা করলে অতীতের সেই মহীয়সী স্ত্রীরত্নদের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাবে। এহেন শালবতী-স্ত্রীরত্নের গর্ভজাত সন্তান কুমার জীবক নিজের শৌর্য ও তেজস্বিতায় কিরূপে শরীরতত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়সমূহ অধিগত করলেন এবং ভেষজবিজ্ঞানে ও শল্যবিদ্যায় নতুন নতুন সূত্র উদ্ভাবন করলেন, তা চিন্তা করলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। জীবন

তাকে বহুবার খ্রিয়মান করেছে, তবু তিনি বার বার জীবনকে উজ্জীবিত করে প্রকৃত জীবন-জয়িতার ভূমিকাই পালন করেছেন। সে যুগে সাধারণ নাগরিকদের জীবনের চেয়ে ভিক্ষুশ্রমণদের জীবনকে অনেক বেশি মূল্যবান বলে গণ্য করা হতো। তা শুধু ধর্মীয় কারণে নয়, সামাজিক কারণেও বটে। কারণ সে যুগে রোগে-শোকে, দুঃখে-দারিদ্র্যে, শিক্ষায়-দীক্ষায় ভিক্ষুশ্রমণরাই ছিলেন জনসাধারণের প্রকৃত বান্ধব। এযুগে খ্রিস্টান মিশনারিদের হিতসাধিনী কার্যাবলীর চেয়েও বহুগুণে উন্নত ও মানবতামণ্ডিত ছিল তৎকালীন বুদ্ধশ্রাবক সংঘের জনহিতমূলক কার্যকলাপ। এমন কি স্বয়ং বুদ্ধ স্বহস্তে জনৈক পীড়িত ভিক্ষুর গুণ্ধাষা করেছিলেন। এ সকল সেবাবোধ-নিমিত্তদর্শী সেবাব্রতী ভিষগাচার্য জীবক তাই নৃপতি বিম্বিসারের অনুরোধক্রমে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের চিকিৎসাকার্যে। নতুবা জীবক কেবলমাত্র বুদ্ধ ও রাজপরিবারের চিকিৎসকরূপে কর্তব্য পালনের পরে, অবসর সময়ে দুঃস্থ-দরিদ্র ‘পরিহৃত-সর্বপীড়া’ সাধারণ নাগরিকদের চিকিৎসাবিধান দ্বারা সমাজসেবা করতেন। তিনি জেনেছিলেন, ভিক্ষুসংঘই সাধারণ নাগরিকদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের নিয়ামক। এবং এই বোধই তাঁকে জীবনের অন্তিম-মুহূর্ত পর্যন্ত উদ্বুদ্ধ করেছিল ভিক্ষুসংঘের চিকিৎসায়। উৎকট পঞ্চব্যাপ্তিগ্ৰস্ত বহু সাধারণ নাগরিক ভিক্ষুব্রত গ্রহণ না করা পর্যন্ত জীবকের সুচিকিৎসা লাভে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

মহতের সাহচর্যে মদগবীরও গর্ব চূর্ণ হয়। নৃপতি অজাতশত্রুর জীবনে জীবকের প্রভাব যদি না পড়তো, তবে অজাতশত্রুর উদ্ধারপ্রাপ্তি ছিল সুদূরপর্যন্ত। যে পরিবেশে জীবক অজাতশত্রুকে বুদ্ধ সন্নিধানে উপনীত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন-আলোচ্য গ্রন্থে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তার পূর্বেও একটি আখ্যান রয়েছে বলে জানা যায়। তখন মগধে-কোশলে তুমুল যুদ্ধ চলেছে। মাতুল প্রসেনজিৎকে পরাস্ত করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। অজাতশত্রুর শোণিত-পিপাসা তাই প্রবলতর হচ্ছে। আক্রান্ত হলেন তিনি অনিদ্রা-রোগে। রাজবৈদ্য জীবক পরামর্শ দিলেন-নৃপমণির সুনিদ্রা লাভের ওষুধ মাত্র একটিই আছে, অবিরাম ‘বুদ্ধ বুদ্ধ বুদ্ধ’ বুদ্ধনাম জপ করে যাওয়া-যেমন একালেও কোন কোন বিচক্ষণ চিকিৎসক ঘুমের অতি সরল ও বিশেষ ফলপ্রদ ওষুধরূপে এক থেকে একশ’ পর্যন্ত গণনা করবার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। জীবকের নির্দেশিত উপায়ে বুদ্ধনাম জপ করতে করতে অজাতশত্রু সুখনিদ্রায় অভিভূত হলেন এবং পরদিন

তিনি জীবক সমভিব্যাহারে উত্তম-সত্তম বুদ্ধের সমক্ষে উপস্থিত হলেন। জীবকের ব্যবস্থা যে কত সুচিন্তিত এবং তাঁর মুষ্টিযোগ যে কত অনায়াসসাধ্য এ ঘটনা থেকেই তো বিশেষভাবে উপলব্ধ হবে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয় বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় ও জীবনীগ্রন্থ প্রণেতা। মহামতি জীবকের অনবদ্য জীবনদর্শনের বহুমুখী বিশ্লেষণ সার্থকভাবেই তিনি সাহিত্যরসাস্রিত সুললিত ভাষায় বিবৃত ও বিধৃত করেছেন ‘জীবক’ গ্রন্থে। প্রাচীন বৌদ্ধমনীষীগণের জীবনচরিত যত বেশি আলোচিত হয় ততই মঙ্গল। আমাদের অন্ধকার জীবনে এগুলিই আলোর প্রতীক। শ্রীমৎ মহাস্থবিরের শ্রম সফল হোক, ‘জীবক’ ঘরে ঘরে বিরাজ করুন।

অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা, ২৫০৮ বুদ্ধবর্ষ

হাইদচকিয়া, ফটিকছড়ি

চট্টগ্রাম।

অশোক বড়ুয়া

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বুদ্ধকালে এই ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রথিতযশা ভৈষজ্যবিশারদ জীবক। তাঁর জীবন-কাহিনী বড় করুণ, বড় বৈচিত্র্যপূর্ণ। জীবজগতে সর্বাস্থীন পুণ্য-বিমণ্ডিত মানব দেখা যায় না। সকলেই পুণ্যাপুণ্য মিশ্রিত। সকলেই সুখ দুঃখের জোয়ার-ভাটায়, জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ-তাড়নায় অনন্ত-অসীমের দিকে ধাবিত। মনীষী জীবকও সেই ধর্মাধীন। তাঁর জীবনও কুশলাকুশল মিশ্রিত। নগর-যোষিণী বারবিলাসিনীর গর্ভে জন্ম নিয়ে নির্মমভাবে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁর কর্মচক্র হলো বিবর্তিত। অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সাফল্যের পর সাফল্য লাভ করে তিনি কেবল জীবন-প্রতিষ্ঠাই অর্জন করেননি, পরস্তু দেখিয়ে গেছেন-কি ভাবে পতিত-অবহেলিত মানব উন্নীত হতে পারে শ্রেষ্ঠত্বে। ভগবান গৌতম বুদ্ধের সান্নিধ্য ও ধর্মোপদেশ লাভে তাঁর জীবন হয়েছিল ধন্য ও পুণ্যপূত। ত্রিরত্নের এমন একনিষ্ঠ সেবক, দায়ক ও উপাসক নিতান্তই বিরল। কর্মজীবনের সাফল্যের সঙ্গে ধর্মজীবনের উৎকর্ষতা সংযুক্ত হয়েছিল তাঁর জীবনে। যেমন ছিলেন তিনি চিকিৎসা-ধন্বন্তরী, তেমনি লাভ করেছিলেন তিনি স্রোতাপত্তি মার্গফল।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে সিংহলের অন্তর্গত পানাদুর-গ্রামের সদ্ধর্মোদয় পরিবেশে আমি যখন শিক্ষার্থীরূপে অবস্থান করছিলাম সেই সময়ে জীবকের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন-কাহিনী আমার চিত্তপটে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তখনই আমার মনে প্রবল আগ্রহের সঞ্চার হয় জীবকের মর্মস্পর্শী চরিতকথা লোকচক্ষুর গোচরীভূত করার। কিন্তু শিক্ষাকার্যে ব্যস্ত থাকায় সেখানে আমার উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব হয় নি। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে রেঙ্গুন বৌদ্ধ-মিশন ও ‘সংঘশক্তি’ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ববহুল কার্যে লিপ্ত থাকাকালীন আমার চিত্তসন্ততিতে সুপ্ত ‘জীবক’ জাগ্রত হয়ে আমার সমগ্র অন্তর অধিকার করে বসলেন। তখনই পুণ্যপূত জীবকের অনবদ্য-জীবন স্মরণ করে তাঁর করুণ-কাহিনী লিখতে লেখনী ধারণ করলাম। এ মহাপুরুষের সুদীর্ঘ জীবনী লেখা সমাপ্ত হয় ১৯৩৮ সনের ১৩ই মে, শুক্রবার, বৈশাখী পূর্ণিমার শুভ তিথিতে। বিবিধ গ্রন্থ থেকে তথ্যাবলী চয়ন করে সুশৃঙ্খলায় রচনা করতে হয়েছে জীবকের পূর্ণাঙ্গ-জীবনী। এজন্যে আমাকে মনোরথ-পূরণী, বিনয় মহাবর্গ, সমস্তপাসাদিকা, মধ্যম নিকায়,

প্রপঞ্চসূদনী, দীর্ঘনিকায়, সুমঙ্গল বিলাসিনী, ধর্মপদার্থকথা, বিমানবথু ও তদার্থকথার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হলে, তা অর্পণ করলাম রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা, আমার পরমারাধ্য গুরু-আচার্য অগ্রমহাপণ্ডিত শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির মহোদয়কে। তিনি সানন্দে গ্রন্থটি আদ্যন্ত পাঠ করে বহু বিষয় সংশোধন করলেন। কিন্তু তা' যন্ত্রস্ত করা সম্ভব হয়নি, নানা বাধা-বিঘ্নের দরুন। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে স্বগ্রাম নানুপুরে প্রত্যাবর্তন করি। সেখানে অবস্থানকালে ফটিকছড়ির অন্তর্গত ছিলোনীয়া (জানারখিল) নিবাসী তত্ত্বজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎসু, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত খ্যাতনামা ভিষকপ্রবর, সাহিত্যসেবী ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া একদিন এসে এই পাণ্ডুলিপি নিয়ে যান। আমার অনুরোধক্রমে তিনিও পরিমার্জিত করলেন গ্রন্থটি। দুঃখের বিষয়, এ গ্রন্থ আজ তাঁর নয়ন-গোচর হলো না। তিনি এখন ইহজগতে নেই। ১৯৫০ সনে এক দুর্ঘটনায় তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। পরলোকে তিনি শান্তি লাভ করুন, এই আমার আন্তরিক কামনা।

তারপর দীর্ঘকাল অতীত হলো, এ গ্রন্থ যন্ত্রস্ত করার তেমন সুযোগ ঘটলো না। বিশেষত মহাযুদ্ধের পর সর্বত্র দেখা দিল হাহাকার, অভাব-অনটন। সুতরাং এ দুর্যোগে পুস্তক প্রকাশের আশাও হলো অন্তর্হিত। এরপর, ১৯৬৪ সনের প্রথম ভাগে পার্বত্য চট্টগ্রামের মুবাছড়ি গৌতম বিহারের প্রধান অধ্যক্ষ ও মায়ানী বোয়ালখালীর দশবল রাজবিহারের সর্বাধ্যক্ষ শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী স্থবির আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ মানসে বৈদ্যপাড়া শাক্যমুনি বিহারে উপনীত হলে তাঁর সুদৃষ্টিতে পড়লো জীবকের পাণ্ডুলিপি। উপায়কুশল শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী পার্বত্য চট্টগ্রামের বাবুছড়া গ্রামে বৌদ্ধনীতি বিহারে অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সুনন্দ ভিক্ষুর নিকট উপনীত হলেন। [তাঁর জন্মস্থান-হাইদচকিয়া (ফটিকছড়ি), গৃহীনাম-বিধু ভূষণ বড়ুয়া, পিতার নাম- পুষ্কর চন্দ্র বড়ুয়া, মাতার নাম- ফুলকুমারী বড়ুয়া]। প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাঁর স্বভাব-সুলভ বাক্য-সুধায় অনুরোধ জানালেন শ্রীমৎ সুনন্দ ভিক্ষুকে এ গ্রন্থের প্রকাশন-ব্যবস্থা করার জন্যে। শ্রীমৎ স্থবিরের অনুপ্রেরণায় ধর্ম-দান ও জ্ঞানদানের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলেন তিনি। ভিক্ষু সুনন্দ আনন্দিত, উৎসাহিত ও উদ্দীপিত হয়ে স্বীকৃতি দান করলেন-তিনি হবেন জীবকের প্রকাশক। সংরক্ষিত হলো স্বীকৃতি সার্থকতা। সর্দ্ধমহিতৈষী উদারমনা শ্রীমৎ সুনন্দ ভিক্ষুর নিঃস্বার্থ দানেই

এই গ্রন্থ সহসা প্রকাশিত করে লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করা সম্ভব হলো। আমার বহুকাল-পোষিত কল্ললতা হলো ফল-পুষ্প সুশোভিত। বলাবাহুল্য, ভিক্ষু সুনন্দের এই উদারতা বুদ্ধ-শাসনের তথা সমাজের মহদুপকার সাধন করলো। সর্বাঙ্গকরণে তাঁকে এবং সেই সঙ্গে শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী স্থবিরকেও আশীর্বাদ করি- ধর্মদান ও জ্ঞানদানের অপরিমেয় পুণ্যপ্রভাবে অর্জিত হোক তাঁদের অতুলনীয় প্রজ্ঞাসম্পদ, যে প্রজ্ঞাসম্পদে হয় তৃষ্ণাক্ষয়, লাভ হয় অর্হত্ব। কামনা করি, তাঁরা হোন চিরশান্তির অধিকারী।

বৈদ্যপাড়া নিবাসী প্রবীণ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন বড়ুয়া ও চট্টগ্রাম কলেজিয়েট হাই স্কুলের সুযোগ্য পালি-শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূপতি রঞ্জন বড়ুয়া বি-এ, সূত্রবিশারদ মহোদয়গণ এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির যথেষ্ট সৌষ্ঠব সাধন করেছেন। তাঁদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি।

হাইদচকিয়া [ফটিকছড়ি] নিবাসী প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অশোক বড়ুয়া এ গ্রন্থকে সর্বাংশে সাহিত্য-গুণামণ্ডিত করে দিয়েছেন উপযুক্ত শব্দ-চয়ন ও ভাষার যথাযোগ্য পরিবর্তন সাধন করে। বিশেষত এ গ্রন্থের ভূমিকা তিনিই রচনা করেছেন। তাঁর নিকট সাহিত্যিক সুলভ মূল্যবান সহায়তা পেয়ে আমি সন্তোষে অন্তরে আশীর্বাদ করি-তিনি মহত্তর প্রজ্ঞার অধিকারী হোন।

চট্টগ্রাম সদর পোস্ট অফিসে কর্মরত পোস্টাল ইন্সপেক্টর, ছিলোনীয়া [ফটিকছড়ি] গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া এ পুস্তক সম্বন্ধীয় বিবিধ কার্যে সাহায্য করে আমাকে বিশেষ উপকৃত করেছেন। তাঁকে আশীর্বাদ করি, তাঁর সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হোক।

করল নিবাসী চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত চিত্ত রঞ্জন চৌধুরী মহোদয় সযত্নে পুস্তকের প্রচ্ছদপট্ অঙ্কন করে দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। রাউজান নিবাসী শ্রীযুক্ত কিরণ বিকাশ বড়ুয়া মহোদয় নিপুণতার সহিত প্রচ্ছদপটের ব্লক প্রস্তুত করে দিয়ে ধন্যবাদার্থ হয়েছেন।

সিগ্নেট প্রেসের পরিচালকবৃন্দের সৌজন্য ও কর্মকুশলতা মুদ্রণ কার্যকে করেছে সুন্দর ও প্রসন্নতাব্যঞ্জক। এ জন্যে আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বুদ্ধ-শাসন, সমাজ ও জনকল্যাণার্থে 'ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড' পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ও কর্মশক্তি দর্শনে জনসাধারণ নিশ্চয়ই সন্তোষ লাভ করবেন। এই বোর্ড সময়ে কোন-কোন পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করবে।

এই বোর্ডের প্রতি সাধারণের অনুকম্পা থাকলে নিশ্চয়ই বোর্ডের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হবে। সুতরাং বোর্ডের প্রতি সকলের সহানুভূতি ও আনুকূল্য কামনা করি।

যথেষ্ট চেষ্টা করেও নির্ভুল মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা এ ত্রুটি গ্রহণ না করে সংশোধন করে নেবেন।

এই পুস্তক পাঠে জনসাধারণ সামান্যও যদি উপকৃত হন, তাতেও পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

জয়তু বুদ্ধ-সাসনং

ফাল্গুনী পূর্ণিমা
২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ,
২৫০৮ বুঃ, ১৯৬৫ ইং

শ্রী শীলালঙ্কার মহাস্থবির
শাক্যমুনি বিহার
বৈদ্যপাড়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

আশীর্বাণী

জ্ঞান মানুষকে ঋদ্ধ করে ধর্মজ্ঞান মানুষকে পরিশুদ্ধ করে। এজন্য জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হওয়ার পাশাপাশি ধর্মজ্ঞান আত্মস্থ করা মানব মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। অষ্টম সংঘরাজ প্রয়াত শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির রচিত ‘জীবক’ গ্রন্থ পুণ্যস্নাত একজন চিকিৎসকের অমর জীবনকথা— যিনি তথাগত বুদ্ধের সময়কালে তাঁর একান্ত চিকিৎসক ছিলেন। বুদ্ধের প্রতি তার সেবা-শ্রদ্ধা ছিল অতুলনীয়। এ গ্রন্থ পাঠমাত্রই দায়কের চিত্তে ধর্মচেতনা— কর্তব্যবোধের জাগরণ ঘটে।

বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির মহাসচিব লায়ন আদর্শ কুমার বড়ুয়ার অনুপ্রেরণায় এক দীর্ঘ সময় পর অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব বাবু পংকজ বড়ুয়া এ ‘জীবক’ গ্রন্থ পুনঃসংস্করণের সাধু উদ্যোগ নিয়ে বৌদ্ধ জনসমাজের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। আমি আশা করি এ ধরনের ধর্ম বিকাশ প্রকাশের কর্মকাণ্ডে আগামীতে অনেকে এগিয়ে আসবেন।

আমি ধর্মানুরাগী পংকজ বড়ুয়ার কর্মধ্যানের আরো প্রসারতা কামনা করি— তার ধর্মচেতনা আরো সৃষ্টিশীল হোক— এ আশীর্বাদ করি।

ধর্মসেন মহাস্থবির

সংঘরাজ,

বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা

উনাইনপুরা লঙ্কারাম বিহার

পটিয়া, চট্টগ্রাম।

অভিমন ও আশীর্বাণী

“জীবক কেবল একটি ভিষক জীবন নয় মহান মানবজীবনও বটে”

যিশুখ্রিস্টের জন্মের বহুপূর্বে বৌদ্ধযুগ। সপ্তম খ্রিস্টপূর্বাব্দে বৌদ্ধযুগ এর সূচনা হয়। মানব সভ্যতার ইতিহাস উল্টালেই চোখে পড়ে বৌদ্ধযুগের চিকিৎসা, ভাষ্কর্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধর্মনীতি, সাহিত্য, শিল্পনীতি, উদার মানবতাবোধ, বৌদ্ধধর্মের পরাকাষ্ঠার এক অতুলনীয় স্বাক্ষর। এক কথায় বলা চলে মানব সভ্যতার এমন কোন বিষয় ছিলনা যাকে বৌদ্ধযুগে স্পর্শ করে তার উৎকর্ষতা সাধন করেনি। বর্তমান যান্ত্রিক প্রযুক্তিকে ভর করে মানুষ উড়োজাহাজে করে বা রকেটে উন্মুক্ত আকাশে পরিভ্রমণ করছে। কিন্তু মহান বুদ্ধ সাধনার বলে মনের একান্ত্রতা সাধন করে আকাশের বুকে ঘূর্ণায়মান পরিক্রমারত গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বিচরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা নিছক কাল্পনিক বিষয় নয়। আমাদের এ সৌরজগতের বাইরে আরও অসংখ্য সৌরজগৎ বর্তমান তা’ জানার সৌভাগ্য হয়েছিল বুদ্ধ এবং বুদ্ধশিষ্য মানবদেহধারী হয়েও ইচ্ছাশক্তি বলে বলীয়ান বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনে। বুদ্ধ সাংসারিক বিষয়বস্তু বিরাগী হয়েও মানব জীবনের অপরিহার্য দিকগুলোও শিক্ষা দিয়ে গেছেন। মহাকরুণাঘন বুদ্ধের অপরিসীম উদার শিক্ষার পরশে কত সাধারণ নগণ্য তুচ্ছ জীবন যে শ্রেষ্ঠত্বে স্থান পেয়েছেন তার হিসাব মেলা ভার। ক্ষৌরকারপুত্র উপালি, নগরশোভিনী আম্রপালী, নরঘাতক অঙ্গুলিমালা, নরমাংসভোজী যক্ষ আলবক, বুদ্ধের অমিয় মুখ নিঃসৃত বাণী ও উপদেশ শুনে তখনকার দিনে এক গৌরবোজ্জ্বল চরিত্রের অধিকারী হয়ে সর্বসাধারণের কাছে নন্দিত হন। বুদ্ধের কাছে কেউ ছোট-বড় ছিল না।

ঠিক সেই সময়ই ভিষকাচার্য জীবকের শালবতী নগরশোভিনীর গর্ভে জন্ম। জীবক রাজা সেনানী বিম্বিসারের পুত্র কুমার অভয়ের স্নেহে তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হয়ে পরিণত বয়সে তখনকার দিনের বিশ্রুত তক্ষশীলার এক অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষালাভ করেন। গুরু তাঁর অভিজ্ঞতা পরীক্ষার জন্য দুই বর্গমাইল পরিমিত স্থান দেখিয়ে এমন কোন তৃণলতা পাতা খোঁজ নিয়ে আসতে বলেন, যা কোন ঔষধে ব্যবহার করা যায় না। একখানা খুস্তি হাতে জীবক সেই পরিমাণ জায়গায় খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগলেন সেই লতা পাতা তৃণ খড় কোন না কোন ঔষধরূপে ব্যবহার করা যায় না। বেশ কিছুদিন খোঁজ করার পর তিনি শূন্য হাতে ফিরে এসে আচার্যকে বললেন— “গুরুদেব, এই স্থানে এমন কোন কিছু দেখতে পেলাম না যা’ কোন না কোন রোগের ঔষধরূপে ব্যবহার করা যাবে না।” গুরুদেব “সাধু সাধু” বলে তাকে অভিনন্দন জানালেন এবং বললেন, “আমার কাছে তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। তুমি চলে যেতে পার। জীবক গুরুদক্ষিণা দিয়ে শূন্য হাতে তক্ষশীলা থেকে অল্পমাত্র খাদ্যাভোজ্য নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। পথিমধ্যে বহুদিনের শিরঃপীড়াগ্রস্ত এক শ্রেষ্ঠীপত্নীর চিকিৎসা করে কয়েক সহস্র টাকা তিনি উপটৌকন পান। সেই অর্থগুলো

তিনি সযত্নে সঙ্গে নিয়ে এসে তার পরম কল্যাণকামী পালক পিতা অভয় রাজকুমারকে দেন। অভয় রাজকুমার তা হাতে নিয়ে পুনঃ জীবককে ফিরিয়ে দিয়ে তার যথা অভিরূচি ব্যাপারে খরচ করতে বললেন। জীবক সেই অর্থে রাজগৃহ নগরে একখণ্ড জমি ক্রয় করে আম্রকাননে সাজিয়ে একখানা সুরম্য বিহার তৈরি করে বুদ্ধকে অবস্থানের জন্য দান করেন। পরবর্তী সময়ে বুদ্ধ জীবক প্রদত্ত আম্রবন বিহারে অবস্থানকালে পিতৃহত্যাজনিত ক্ষোভে দুঃখে স্রিয়মান দক্ষজ্বালায় অতীষ্ঠ মহারাজ অজাতশত্রুকে উপদেশ দিয়ে শাস্ত সৃষ্টির করে তোলেন। ভিষক আচার্য জীবক উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ড প্রদ্যোতের চিকিৎসা করে তাঁকে পাণ্ডুরোগ থেকে মুক্ত করে জীবন দান করেন। জীবক ছিলেন বিশেষত মহারাজ রাজা সেনানী বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং পরে রাজার নির্দেশে তিনি বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। অবসর সময়ে গরীব দুঃখীদের বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা দান করতেন। বর্তমান সময়ের আধুনিক চিকিৎসার বহুপূর্বে জীবক চিকিৎসা জগতে যে নব নব চিকিৎসার অভিনব উপায় কৌশল আবিষ্কার করে মানবসেবা করেন তা' ধারণাভীত। শল্য চিকিৎসায় তিনি তখনকার দিনে মাথার খুলিকে উপরিয়ে মস্তিষ্কের অপারেশন করার কাজে যে চাকু ব্যবহার করতেন পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিশ্রুত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার মানসে তা সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তী সময়ে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক ধ্বংস সাধিত হয়ে ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করে বর্তমানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় সযত্নে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছে। বর্তমান সময়ে চিকিৎসা জগতে যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, তার চাইতে অতীতের চিকিৎসা বিধান কোনক্রমেই খাটো ছিল না।

জীবকের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করার জন্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় মান্যবর শীলালঙ্কার মহাস্থবির, পরবর্তী সময়ে সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাস্থবির বহু গ্রন্থ পর্যালোচনা করেছেন এবং বহু কষ্ট করে তা সংগ্রহ করে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে পুস্তকাকারে গ্রন্থনা করে সকলের জ্ঞান লাভে মহা উপকার সাধন করে গেছেন। প্রথম প্রকাশক শ্রীমৎ সুনন্দ ভিক্ষু, অধুনা ধর্মানুরাগী অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী সজ্জন পংকজ বড়ুয়া পুনঃপ্রকাশের জন্য এগিয়ে এসে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন জেনে খুবই আনন্দবোধ করছি। বইটি প্রকাশনায় বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির মহাসচিব লায়ন আদর্শ কুমার বড়ুয়ার অনুপ্রেরণা ও সমাজসেবা অধিদপ্তরে কর্মরত অসীম কুমার বড়ুয়ার তত্ত্বাবধান ধন্যবাদার্থ। ধর্মপ্রাণ পাঠকদের জন্য গ্রন্থটি বিনামূল্যে বিতরণের উদ্যোগ নেওয়ায় আমি প্রকাশকের ঔদার্যপূর্ণ জীবনের নিরাময়তা ও সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করছি। তার নীরোগ স্বাস্থ্য কামনা করি। আশীর্বাদ করি তিনি দীর্ঘজীবী হোন।

“সব্বে সস্তা সুখীতা ভবন্ত”

এস, ধর্মপাল মহাথের

সংঘনায়ক, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা
শাকপুরা ধর্মানন্দ বিহার, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

অনুভূতি ও আশীর্বাণী

ত্রিপিটকের মূল উদ্দেশ্য দুঃখমুক্তি বা নির্বাণ। নির্বাণ পরম সুখ তাই বুদ্ধের আহ্বান সকল প্রাণী দুঃখ মুক্ত হোক। সম্যকভাবে চিরতরে যাবতীয় দুঃখের অবসান হোক। আমরা ধম্মপদের দিকে তাকালে দেখি,

সক্কে সজ্জারা অনিচ্ছাতি যদা পঞ্ঞায় পস্‌সতি
অথ নিব্বিন্দাতি দুক্‌খে এস মগ্‌গো বিসুদ্বিয়া।

যাবতীয় সংস্কার অনিত্য, ইহা যখন লোকে প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করেন, তখন তিনি দুঃখের প্রতি বিরাগ প্রাপ্ত হন। ইহা বিশুদ্ধি লাভের এক মাত্র পথ।

আমাদের মনে রাখতে হবে চারি আৰ্য সত্যের বাইরে বুদ্ধের কোন কথা নাই, ধর্ম ও নাই। চারি আৰ্য সত্য ব্যতীত নির্বাণ লাভের দ্বিতীয় কোন উপায় ও নাই, তাই প্রত্যেকের উচিত চারি আৰ্য সত্যের অনুশীলন করা। কোথাও যেতে হলে যেমন একটি পথ ধরে চলতে হয়, দুঃখ থেকে চিরমুক্তি পেতে হলে তথা নির্বাণ লাভ করবার জন্য এই আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অর্থাৎ এই সম্যক জীবন যাপন প্রণালী অনুশীলন করে চলতে হয়। আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের এই অঙ্গ তথা নীতিগুলো হলোঃ- (১) সম্যক দৃষ্টি, (২) সম্যক সংকল্প, (৩) সম্যক বাক্য, (৪) সম্যক কর্ম, (৫) সম্যক জীবিকা, (৬) সম্যক বায়াম বা প্রচেষ্টা, (৭) সম্যক স্মৃতি, (৮) সম্যক সমাধি।

এগুলোকে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা- এ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প প্রজ্ঞার অন্তর্গত। সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবিকা শীলের অন্তর্গত। সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি- সমাধির অন্তর্গত।

১। সম্যক দৃষ্টি- চার আৰ্য সত্য হলো দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায় এর যথাযথ জ্ঞানই সম্যক দৃষ্টি।

২। সম্যক সংকল্প- অন্যায় কর্ম বর্জন ও ন্যায় কর্ম সম্পাদনের সংকল্প। ইহা ৩ প্রকার। নৈজ্জম্য সংকল্প, অব্যাপদ সংকল্প ও অবি হিংসা সংকল্প।

৩। সম্যক বাক্য- মিথ্যা, পিণ্ডন, পরুষ ও সম্প্রলাপ বাক্য থেকে বিরত থেকে সত্য বাক্য কথা, প্রিয় ও মিতভাষণ দ্বারা মানুষে মানুষে মৈত্রী সৃষ্টি করা। সত্য, প্রিয় ও মিতভাষণই সম্যক বাক্য।

৪। সম্যক কর্ম- প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার এ তিন প্রকার কর্ম থেকে বিরত থেকে কল্যাণ জনক কর্ম করাই সম্যক কর্ম।

৫। সম্যক জীবিকা- প্রাণী, মাংস, অস্ত্র, বিষ ও নেশাজনক দ্রব্য বাণিজ্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য বাণিজ্য অথবা সং পেশায় দ্বারা জীবিকা হল সম্যক জীবিকা।

৬। সম্যক প্রচেষ্টা- অনুৎপন্ন অকুশল চিন্তা অনুৎপন্নের চেষ্টা, উৎপন্ন অকুশল চিন্তা বিনাশ করার চেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশল চিন্তা উৎপন্ন করার চেষ্টা ও উৎপন্ন কুশল চিন্তা স্থিতি ও বৃদ্ধির চেষ্টাকে সম্যক প্রচেষ্টা বলা হয়।

৭। সম্যক স্মৃতি- কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন ও ধর্মানুদর্শন ভেদে সম্যক স্মৃতি চার প্রকার। চক্ষুর চিত্তের গতিবিধির দিকে দৃষ্টি রেখে ইন্দ্রিয়াদি হতে যে সমস্ত বন্ধন উৎপন্ন হয়, সেগুলো বিনাশ করার চিন্তা জাগরুক রাখাই সম্যক স্মৃতি।

৮। সম্যক সমাধি- চিত্তের পরিপূর্ণ একাগ্রতাকেই সম্যক সমাধি বলা হয়। ভাবনার দ্বারাই চিত্তকে একাগ্র করা সম্ভব।

বাংলাদেশী বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু শ্রদ্ধেয় অষ্টম সংঘরাজ প্রয়াত শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির সহ আমি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড গঠন করি। এই প্রচার বোর্ডের মাধ্যমে আমরা অনেক ধর্মীয় মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করি। তার মধ্যে ‘জীবক’ একটি অমূল্য গ্রন্থ। এই ধর্মীয় গ্রন্থটি পাঠক সমাজের বেশ সমাদৃত হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ দীর্ঘ সময় পর বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির মহাসচিব লায়ন আদর্শ কুমার বড়ুয়ার অনুপ্রেরণায় ও সমাজসেবা অধিদপ্তরে কর্মরত অসীম কুমার বড়ুয়ার তত্ত্বাবধানে অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী লোহাগাড়া উপজেলার মহুদিয়া গ্রামের স্নেহের পঙ্কজ বড়ুয়া কর্তৃক ‘জীবক’ গ্রন্থটি পুনঃ সংস্করণে ব্রতী হয়েছেন জেনে আমি সত্যিই আনন্দিত। বুদ্ধের ধর্ম প্রচার ও প্রসারের এটি একটি নতুন সংযোজন, আমি তাকে অন্তর থেকে আশীর্বাদ জানাই। বুদ্ধের বাণী প্রকাশ ও প্রচারে যারা সহায়তা করে তারা নিজে দুঃখমুক্তি এবং নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন করেন। তাই এরূপ দানকে ধর্ম দান বলে। ধর্মদান সর্বদানের থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই সকলের উচিত নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী বুদ্ধ বাণী প্রচার ও প্রসারে এই ধর্ম দানে অংশ গ্রহণ করা। বুদ্ধ শাসনের ধারণ ও সংরক্ষণের ‘জীবক’ গ্রন্থটি পুনঃ সংস্করণের কাজটি বৌদ্ধ সমাজের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হোক। ধর্মপ্রাণ পাঠকদের জন্য গ্রন্থটি প্রকাশক কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের উদ্যোগ নেওয়ায় এই ধর্মদানের ফলের সকলে বুদ্ধের জ্ঞান ও পরম শান্তি নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক এই কামনা করি।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক

ড. জ্ঞানশ্রী মহাধেরো

উপসংঘরাজ,

বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা

অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার

আশীর্বাণী

সম্যক গ্রন্থপাঠ মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করে। চেতনাকে পরিশুদ্ধ করে। মনোভুবনে নির্মোহ আত্মশুদ্ধির নির্যাস সঞ্চারিত করে। এভাবেই মানুষ নিজেকে একসময়ে এক ব্যতিক্রমী চৈতন্যের সারথী করে তুলতে পারে।

তাই এ নশ্বর জগতে অবিদ্যা তথা কাল অন্ধকারের জীবন রথ ত্যাগ করে সত্যিকারের আত্ম অন্বেষণের পথ অনুসন্ধানই আমাদের একান্ত ব্রত হওয়া উচিত।

শ্রদ্ধেয় অষ্টম সংঘরাজ প্রয়াত শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির রচিত ‘জীবক’ গ্রন্থটি বৌদ্ধ জনমানসের একটি অনুপম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দীর্ঘসময় পর অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী পংকজ বড়ুয়া পুণ্যচেতনায় এ গ্রন্থ আবার পুনঃ সংস্করণের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি তাকে অসীম আশীর্বাদে সিন্ত করছি। আমি বৌদ্ধধর্মের এ ধরনের পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের পুনঃ সংস্করণে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে আসবেন বলে একান্তভাবে আশা করি।

সবের সত্তা সুখিতা হোস্ত।
জগতের সকল প্রাণী সুখি হোক।

সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভণ্ডে)

রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

সম্যক উপলব্ধি ও কৃতজ্ঞতা নিয়ে নিভৃত মনের প্রকাশ

সম্যকভাবে মানুষের ও সকল প্রাণীর প্রতি সদয় হয়ে যিনি কুশল কর্ম সম্পাদন করেন তিনি পুণ্যবান ও মহৎপ্রাণ। এ ধরনের ব্যক্তিত্বরা সত্য সাধনায় নিয়োজিত থেকে বার বার পুণ্য কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে পরের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করেন তাদের জীবন। কর্ম সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষের পরিমন্ডলে সহাবস্থান করে কখনও কখনও সাধারণ মানুষ অসাধারণ মানুষে পরিণত হয় সৎ কর্মের দ্বারা।

তেমনি একজন বৌদ্ধিক চেতনায় সমর্পিত নিবেদিতপ্রাণ অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী পংকজ বড়ুয়া বিশ্ববরেণ্য ধর্মীয় গুরু মহামান্য অষ্টম সংঘরাজ প্রয়াত শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাশ্ববিরের দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে জিনরতন ভিক্ষু তার সান্নিধ্যে থেকে পুণ্যাত্মার সেবা করার যে সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তা তাঁর জীবনকে করেছে ধন্য ও পুণ্যময়। গুরুভক্তের সেবায় যখন নিয়োজিত ছিলেন তখন ভদন্ত তাকে আনন্দ বলে সম্বোধন করতেন। পালি সাহিত্যে বুদ্ধের সেবক ছিলেন অরহৎ আনন্দ মহাথের। সেবাদানের পুণ্যকর্মের প্রভাব অসাধারণ। সেই পুণ্যকর্মের প্রদীপ্ত শিখার আলোকসম্পাত পংকজ বড়ুয়ার জীবনধারাকে করেছে পরিপূর্ণ চিন্তার নায়ক। মাতা পিতাসহ গুরুদেব আদর্শ অনুপ্রাণিত পংকজ বড়ুয়া সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করে ঐগাতকাতঙ্ক সঙ্গহো মহান কর্ম করে যাচ্ছে। বুদ্ধের ভাষায় দানময় কর্ম সম্পাদন করা, ধর্মাচারণ করা ও অনবদ্য কর্ম সম্পাদন করা এবং জ্ঞাতিদের উপকার করা। জ্ঞাতিদের উপকার সাধন করার মধ্যে সকল প্রাণীর প্রতি দয়াবান হয়ে সেবা করার কথা বুদ্ধ বলেছেন। সমাজসঙ্ঘর্ম সেবক পংকজ বড়ুয়া মহামান্য অষ্টম সংঘরাজ ভক্তের রচিত বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বলিত জীবক গ্রন্থটি পুনঃসংস্করণের দায়িত্বভার গ্রহণ করায় তাঁকে বুদ্ধ শাসনের পক্ষ থেকে আন্তরিক আশীর্বাদ জানাই। বুদ্ধের সময়ে জীবক ছিল বুদ্ধ ও সাংঘিক সমাজের একজন চিকিৎসক। জীবকের অসামান্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ও জীবনাদর্শ মহামান্য ভক্তে যেভাবে লেখনীতে ধারণ করেছেন তা অধ্যয়ন করলে বার বার পড়তে ইচ্ছে জাগে। এর আগে রাহুল চরিত গ্রন্থের সংস্করণ করে বুদ্ধ শাসনের প্রভূত উপকার সাধন করেছে।

২০০৭ সালে চন্দনাইশ উপজেলাধীন উত্তর হাসিমপুর বন বিহারের প্রয়াত অধ্যক্ষ সুমনানন্দ শ্ববিরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করে ধন্যবাদর্হ হয়েছে এবং গুরুভক্তের প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য জানাতে সক্ষম হয়েছে। এবার জনহিতৈষী পংকজ বড়ুয়ার দান পরিক্রমায় কিছু কথা লিখতে ইচ্ছে করে। দান কর্ম একটি বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়া ও মানবিক গুণের অন্যতম কৃপণতাকে পরাজয় করে, লোভের দাবানলকে পরাভূত করাই দানের বিশেষ গুণধর্ম। এহেন উদার মানসিকতা নিয়ে যারা দানের হস্ত প্রসারিত করেছে তাদের জীবন অস্মান হয়ে রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। সেই ধারাকে অনুসরণ করে সমাজ সচেতন বৌদ্ধিক চেতনায় সমৃদ্ধ পংকজ বড়ুয়া সুদূর অস্ট্রেলিয়া অবস্থান করেও নিজের তথা মানুষের মঙ্গলের জন্য অকাতরে দান দিয়ে

যাচ্ছে। আমার জানামতে সে প্রতিবৎসর মহামান্য সপ্তম সংঘরাজ সধর্মকীর্তি প্রয়াত অভয়তিষ্য মহাস্থবির, মহাজ্ঞানী জ্ঞানতাপস, আৰ্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির, বিদর্শনাচার্য বাগ্গীশ্বর প্রয়াত বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির, পরম শ্রদ্ধেয় সাধকপ্রবর প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির, সাধকপ্রবর বিদর্শনাচার্য বংশদীপ মহাস্থবির এবং পরম পূজ্য আৰ্যশ্রাবক সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভণ্ডে) এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতিপত্তি পূজা প্রদান করে মহাপুণ্য সঞ্চয় করেছে। অস্ট্রেলিয়ায় মানবতাবাদী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সেন্ট ডিনসেন্ট হাসপাতালে সম্যক জীবিকালব্ধ অর্থ দিয়ে দশ হাজার ডলার দান করেছেন। মানবাধিকার সংস্থাকে প্রতি বৎসর এক হাজার পাঁচশত ডলার দান করে দানপারমি পূর্ণ করেছে। অস্ট্রেলিয়ায় চাকরি করতে গিয়ে ও গরীব বিবাহযোগ্য মেয়েদের অর্থ সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। দেখা যায়, এ যাবত প্রায় ৮/১০ জন মেয়েকে পাত্রস্থ করতে সহায়তা দান করেছে। লোহাগাড়া মহদিয়া জ্ঞানবিকাশ বিহারে এক লক্ষ টাকা, চন্দনাইশ উপজেলার দক্ষিণ হাশিমপুর বিজয়ারাম বিহারে এক লক্ষ টাকা, আনোয়ারা মুৎসুদ্দিপাড়া সাধকপ্রবর মহাস্থবিরের সাধনপীঠ বিবেকরাম বিহারে এক লক্ষ টাকা, সমাজসঙ্ঘ বিকাশের ক্ষেত্রে ধর্মীয় গ্রন্থ সংস্করণ, মহান পুরুষদের ও কালগত জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে সংঘদান সম্পাদন পুণ্য পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, মাতা পিতার আদর্শ রক্ষায় প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদন ইত্যাদি মানবীয় কুশল কর্ম করে যাচ্ছে ইহকাল ও পরকালের সুখ-শান্তি কামনায়।

আমার জানামতে তার জীবনে বিশেষভাবে জীবনের ফুল ফুটিয়ে তুলেছে মাতা-পিতা ছাড়াও মহামান্য গুরুদেব অষ্টম সংঘরাজ ভণ্ডে এবং শতাব্দীর প্রাচীন বৌদ্ধ সংগঠন বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির মহাসচিব লায়ন আদর্শ কুমার বড়ুয়া মহোদয়। তাঁদের আশীর্বাদ এবং পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে সামান্য সামান্য দান দিয়ে নিজ জীবনকে ধন্য করেছে। মহামান্য অষ্টম সংঘরাজ ভণ্ডের “জীবক” গ্রন্থটি অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ লায়ন আদর্শ কুমার বড়ুয়ার সুখময় জীবনের উদ্দেশ্যে পুণ্যদান করে এবং সংকাজ ধৈর্যস্থিত কাজ বলে এ রকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই তাকে এ মহৎ কর্ম কাজের জন্য সাধুবাদ ও মৈত্রীপূর্ণ আশীর্বাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে, আমি তাকে আন্তরিকতার সাথে বলব সমাজ, সঙ্ঘের জন্য স্থায়ী একটি কল্যাণ ট্রাস্ট করে গুরুজনদের আদর্শ রক্ষা করতে। সেই কল্যাণ ট্রাস্ট হোক শুধুমাত্র ভিক্ষু ধর্ম বিনয়ের সুশিক্ষার জন্য সাহায্য প্রদান, বৃদ্ধাবস্থায় ও অসুস্থাবস্থায় সাহায্য দান ও বিবিধভাবে সেবা দান। তাঁর মাজলিক, সমাজ সংস্কারমূলক, ধর্মীয় কার্য সম্পাদনে, সঙ্ঘ বিকাশে, প্রকাশে, গরীব মানুষের সাহায্য দানের জন্য ও পংকজ বড়ুয়া ভাবী জীবনে আরো সঙ্ঘ সেবায় আত্মনিবেদিত হোক এই কামনা করে আমার লেখার ইতি টানছি।

বসুমিত্র মহাথের এম.এ

অধ্যক্ষ, ফতেনগর বেনুবন বিহার

চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

শ্রদ্ধা ও অনুভূতি

‘জীবক’ বইটি অষ্টম সংঘরাজ সাহিত্যরত্ন শ্রদ্ধেয় প্রয়াত শীলালঙ্কার মহাস্থবিরের অবিস্মরণীয় কীর্তি। পরমারাধ্য অষ্টম সংঘরাজ মহাস্থবির একজন সুদেশক ও সুলেখক সর্বজননন্দিত হিসেবে বৌদ্ধ সমাজে পরিচিত। ধর্ম, বিনয় শিক্ষায় তার মেধা ও প্রাজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। অত্যন্ত বিনয় স্বভাবের অধিকারী এ মহান সংঘমনীষা সমগ্র জীবন সঙ্কর্মসেবায় উৎসর্গীত মহাপ্রাণ বুদ্ধের দেশিত সূত্র বিনয় অভিধর্মের তত্ত্বগুলি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও চমৎকারীত্বের সাথে বর্ণনা করতে পারতেন। মাননীয় সংঘরাজ বোয়ালখালী থানার বৈদ্যপাড়া গ্রামে শাক্যমুনি বিহারে অবস্থানকালীন ১৯৬৫ইং সালে ‘জীবক’ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশকের দায়িত্বে ছিলেন শ্রীমৎ সুনন্দ ভিক্ষু। অষ্টম সংঘরাজ মহাস্থবিরের একান্ত অনুসারী এবং তাঁর শিষ্য জীবক বইটি পুনরায় প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, সঙ্কর্মে কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ সমাজের আলোকবর্তিকা বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির মহাসচিব লায়ন আদর্শ কুমার বড়ুয়া এই গ্রন্থ প্রকাশনার দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেছেন, যার এই দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ না পেলে “জীবক” গ্রন্থটি পুনঃসংস্করণ করা খুবই দুর্লভ হয়ে পড়তো। প্রকাশক নিজেই “জীবক” গ্রন্থটি মহান আদর্শের প্রতীক লায়ন আদর্শ কুমার বড়ুয়ার নীরোগ, দীর্ঘায়ু কামনায় প্রকাশ করায় আমি আন্তরিকভাবে বাবু পংকজ বড়ুয়াকে আশীর্বাদ জানিয়ে তাঁর শ্রীবৃদ্ধি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করছি। বইটি সংগ্রহ করে দেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন দক্ষিণ হাশিমপুর বিজয়ারাম বিহারে অবস্থানরত শ্রীমৎ শক্তিমান শ্রমণ। এছাড়া জীবক বইটি পুনঃপ্রকাশের ব্যাপারে সার্বিক যোগাযোগ ও তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে পরিশ্রম করেন সমাজসেবা অধিদপ্তরে কর্মরত রাউজান উপজেলার আবুরখীল নন্দনকানন নিবাসী বাবু অসীম কুমার বড়ুয়া।

পরিশেষে ‘জীবক’ গ্রন্থটি পুনঃসংস্কার করতে গিয়ে যাঁরা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্নভাবে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক।

অশ্বজিৎ ভিক্ষু

অধ্যক্ষ, কোলাগাঁও সার্বজনীন রত্নাকুর বৌদ্ধ বিহার
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকের নিবেদন

স্মৃতি সতত সুখের। অষ্টম সংঘরাজ আমার পরমারাধ্য গুরুদেব প্রয়াত শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবিরের বৌদ্ধ সমাজ চেতনার আকর্ষণীয় সুখপাঠ্য ‘জীবক’ গ্রন্থের পুনঃ সংস্করণের প্রকাশকের কথা লিখতে বসে তাই আজ ফেলে আসা জীবনের কতো কথাই না মনে পড়ছে।

মনে পড়ছে জন্মদাতা পিতা স্বর্গীয় নীর রতন বড়ুয়া ও জন্মদাত্রী মাতা লুলু বালা বড়ুয়ার কথা। কী অপার স্নেহ-যত্নে তারা আমাকে লালিত পালিত করেছেন, বৌদ্ধ জনমানসের মৈত্রীময় জগতের প্রতি অবিস্ট করে আমার জীবনকে ধন্য করেছে।

একসময় গুরুদেব অষ্টম সংঘরাজের স্নেহ-সান্নিধ্য লাভের যে মহতী সুযোগ আমার হয়েছে তাকে আমি আমার জীবনের এক অপরিণীম পুণ্যস্নাত প্রাপ্তি বলে মনে করি। তখন থেকে বৌদ্ধধর্মের ক্ষণজন্মা মনীষীদের জীবনী পাঠ অনুধ্যান আমাকে গভীর আনন্দ দিতো, তাদের জীবনকথা নিয়ে কিছু একটা করার ভাবনা সবসময় আমার মনে উঁকি দিতো। পরবর্তীতে শ্রীমৎ অশ্বজিৎ ডিম্ফুর কাছে আমার মনোবাসনা প্রকাশ করত তিনি আনন্দে আমার ইচ্ছার প্রতি সমর্থন-সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। আমাকে এক মহতী কাজে ব্রতী করে তোলেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর উৎসাহ অনুপ্রেরণায় ‘জীবক’ গ্রন্থের পুনঃ সংস্করণে আমার নিবিষ্ট হওয়া।

সমাজসেবায় নিরন্তর নিবেদিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুপরিচিত সদ্ধর্মপ্রাণ লায়ন আদর্শ কুমার বড়ুয়া আমার জীবনের এক ধ্রুবতারা। তাঁর আলোকচ্ছটায় আমি হয়েছি আলোকিত। তিনি আমাকে উদ্ভাসিত করেছেন জীবনের এক ভিন্নতর দিগন্তে। তাঁর স্নেহধন্য উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে এক সুন্দর জীবন গঠন করে আমি সুদূর প্রবাসে থেকেও তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তিনি প্রায়শ আমাকে উৎসাহিত করেছেন, উজ্জীবিত করেছেন বৌদ্ধ জনসমাজ সুরক্ষায় নানা পুণ্যময় কাজে অংশ নিতে। ‘জীবক’ এর এ নবতর সংস্করণের পেছনে তাঁর আহ্বান ঐকান্তিকতা আমাকে সতত অনুপ্রেরণা-উৎসাহ জুগিয়েছে। তাই অত্যন্ত আনন্দচিত্তে ধর্মজ্ঞানে আমি ‘জীবক’ গ্রন্থটি তাঁর নীরোগ কর্মমুখর দীর্ঘায়ু কামনায় সমর্পিত করে তাঁর প্রতি আবারও শ্রদ্ধা জানালাম।

‘জীবক’ গ্রন্থের এ পুনঃসংস্করণে তত্ত্বাবধান করেন লায়ন আদর্শ কুমার বড়ুয়ার নিকটতম আত্মীয় অসীম কুমার বড়ুয়া। এছাড়া শ্রীমৎ শক্তিমান শ্রমণ সাংবাদিক কাঞ্চন বড়ুয়া, সাংবাদিক বিপুল বড়ুয়া, চিত্রশিল্পী উত্তম বড়ুয়া প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা যে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থের মুদ্রণ-অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ধনে ‘অমিতাভ’ সম্পাদক ইন্টারস্পেস কমিউনিকেশনের স্বত্বাধিকারী শ্যামল চৌধুরীর শ্রম নিষ্ঠার জন্য তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে ‘জীবক’ গ্রন্থ পাঠে সবার চিত্তে ধর্মজ্ঞান বৌদ্ধমানস আরো প্রগাঢ় হোক এই কামনা করি।

পংকজ বড়ুয়া

জীবক

। এক ।

‘দাসি!’

‘কি বলছেন মা?’

‘কি সন্তান জন্মেছে?’

‘পুত্র সন্তান ।’

‘দূর কর, দূর কর, দূরে আবর্জনায় নিক্ষেপ করে আয় ।’

‘সুন্দর, সুগঠন, সোনার বরণ ছেলে মা!,

‘আমি ছেলে কামনা করিনি, তুই ফেলে দিয়ে আয় ।’

‘এমন ছেলে কি করে ফেলে দেবো মা?’

‘আমার কথার উপর আবার তোর কথা? এখনি নিয়ে যা’ ।

‘প্রাণে যে সহ্য হচ্ছে না মা!’

‘একি বলছি! তুই! এতো দয়াবতী হ’লি কেন? বলছি, এখনি নিয়ে যা ।’

‘তবে যাচ্ছি মা!’

* * * * *

নিশীথিনী । ধরিত্রী নীরব নিখর । চতুর্দিক গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন । সে' অন্ধতামসে এক রমণী চঞ্চল-গতিতে চলে যাচ্ছে । কোনো দিকে ওর লক্ষ নেই । বুকে পাষাণ বেঁধে, একখানা জীর্ণ-ভাঙা কুলোয় এক নবজাত শিশুকে নিয়ে চলেছে । তার নিকটে-দূরে অসংখ্য জোনাকিপোকা ক্ষণে ক্ষণে প্রভা বিস্তার করে তাকে যেন বলে দিচ্ছে-পথের সন্ধান । সেই তমিস্রাজনীর নিস্তব্ধতা ভেঙে শোনা যাচ্ছে কেবল-নিশার ঝিল্লীরব, দূরে দু'একটা সারমেয়ের বিকট-চীৎকার ।

রমণী চলতে চলতে পথের ধারে এক ঝোপের প্রান্তে এসে দাঁড়ালো আবর্জনা রাশির উপর । শিশুকে রাখলো অতি সন্তর্পণে । সে সঙ্গে তার দু'বিন্দু অশ্রু বারে পড়লো শিশুর ললাটে । তখন এক দীর্ঘশ্বাসের পর করুণ ব্যথিত-কণ্ঠে সে বলে উঠলো-‘হায়-রে অভাগা! এই কি তোর ললাট-লিখন!’ নৈশ-অন্ধকারময় নির্জন প্রান্তরে শিশুকে একাকী বিসর্জন দিয়ে যেতে তার প্রাণে অসহ্য বেদনা সঞ্চারিত হলো । এক একবার ইচ্ছা হলো-শিশুকে বক্ষে তুলে নিয়ে কোথাও সে উধাও হয়ে যায় । তখন ঝোপের প্রান্তভাগ শৃঙ্গালের বিকট-ধ্বনির সঙ্গে কেঁপে উঠলো । ভয়ে রোমাঞ্চিত হলো নারীর সর্বাঙ্গ । সে আর ক্ষণবিলম্ব না করে দ্রুত পদবিক্ষেপে প্রস্থান করলো । তখন শিশু কেঁদে উঠলো আতর্কণ্ঠে । শিশুর করুণ রোদন-ধ্বনি রমণীর হৃদয়কে বারেকের তরে কাঁপিয়ে তুললো । পা যেন তার অবশ হয়ে এলো; কিন্তু, পারলো না আর দাঁড়াতে । সে যতোই দূর হতে দূরান্তরে চলে যেতে লাগলো, শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনিও ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে তার কর্ণে ধ্বনিত হতে লাগলো । ক্রমশঃ সেই রোদন-ধ্বনি যেন গভীর তিমিরাচ্ছন্ন দিগন্তে বিলীন হয়ে গেলো । সঙ্গে সঙ্গে রমণীর বেদনা-মথিত হৃদয়ের অন্তস্থল হতে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে নৈশ-অন্ধকারের বায়ুর সাথে মিশে গেলো ।

॥ দুই ॥

বৈশালী পরম রমণীয়া নগরী, সমৃদ্ধা ও শ্রীসৌভাগ্যে সমন্বিতা । পরাক্রান্ত লিচ্ছবিরাজ এমন সুশৃংখলায় বৈশালীকে সাজিয়ে রেখেছে, দেখলে মনে হয়-তা' যেন একখানা প্রমোদ উদ্যান । এ রাজ্যের রাজা-প্রজা ন্যায়-নিষ্ঠায় ও শৌর্যে-বীর্যে অদ্বিতীয় । বৈশালীবাসীরা লিচ্ছবি নামে খ্যাত । ভুলোকে তাদের সৌন্দর্যের তুলনা নেই । ভগবান বুদ্ধ তাদের তুলনা করতেন 'তাবতিংস' স্বর্গের দেবতাদের সাথে ।

এক সময় তথাগত কোটিগ্রামে অবস্থান করেছিলেন । লিচ্ছবিগণ তাঁকে দর্শন মানসে ধবজা-পতাকায় সজ্জিত উত্তম রথারোহণে কোটিগ্রামাভিমুখে অগ্রসর হলো । তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সজ্জা বড়ো মনোরম । যাদের শরীর নীলবর্ণ-তারা নীল-বস্ত্রে ও নীল-অলঙ্কারে; যারা পীতবর্ণ-তারা পীতবস্ত্রে ও পীত অলঙ্কারে; যারা রক্তিমবর্ণ-তারা রক্তিমবস্ত্রে ও রক্তিম অলঙ্কারে; যারা শ্বেতবর্ণ-তারা শ্বেত বস্ত্রে ও শ্বেত-অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়েছিলো ।

ভগবান দূর থেকে দেখতে পেলেন- লিচ্ছবিগণ আসছে । তখন তিনি বিহারবাসী ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন- 'ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে যারা 'তাবতিংসে'র দেবগণকে দেখেনি, তারা এই লিচ্ছবিগণকে দেখে নাও । এ লিচ্ছবি পরিষদ তাবতিংসের দেব পরিষদ তুল্য মনে করো ।'

লিচ্ছবি রাজ্য বৈশালী অদ্বিতীয় ভূস্বর্গ । সেই শ্রীসৌভাগ্য সমুন্নতা নগরী সাত হাজার সাতশত সাতখানা কারুকার্য খচিত প্রাসাদ, তত সংখ্যক সুদৃশ্য কূটাগার, সুরম্য উদ্যান ও স্বচ্ছ সলিলা পুষ্করিণীতে পরিশোভিত । দেখলে মনে হয়- যেন কোনো এক সুদক্ষ চিত্রকরের সুকৌশলে তুলি চালনায় অঙ্কিত একখানা নয়নাভিরাম চিত্র ।

বারাঙ্গনা অম্বপালী বৈশালীর আর এক অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য । তার কমণীয় কান্তি, লালিত্যময় রূপমাধুরী সমগ্র বৈশালীকে বিমুগ্ধ করে রেখেছে । নৃত্য-গীতে অদ্বিতীয়া, বাদ্যে নিপুণা অম্বপালী বৈশালীর সৌন্দর্যকে অধিকতর ফুটিয়ে তুলেছে ।

* * * * *

একদা রাজগৃহবাসী জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি কোনো কার্যব্যপদেশে বৈশালীতে আগমন করেন। তিনি এ নগরীর সৌভাগ্য দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। যেদিক নয়ন গোচর হয়, সেদিকই মনোহারিত্বময় সৌন্দর্যপূর্ণ। ততোধিক তিনি চমৎকৃত হলেন অম্বপালীর লাবণ্যোজ্জ্বল রূপ দর্শনে। ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে রাজা বিম্বিসারকে নিবেদন করলেন— ‘দেব’ বৈশালী যেরূপ জনাকীর্ণ, সমৃদ্ধ ও ভোগৈশ্বর্য সম্পন্ন বাস্তবিকই তা’ বিস্ময়ের বিষয়। ততোধিক বিস্ময়কর অম্বপালী গণিকা। অবর্ণনীয় তার রূপমাধুরী; নৃত্য পটুতায়, সুকণ্ঠের মাধুর্যে ও রূপ-লালিত্যে বৈশালী বাসীকে মুগ্ধ করে রেখেছে! মহারাজ, আমরাও কি পারিনা, কোনও এক সুশোভনা নারীকে অম্বপালীর মতো জ্বীরত্বে পরিণত করতে? রাজা বললেন— ‘নিশ্চয়ই, কেন পারা যাবে না। তোমরাও অনুরূপ কুমারী একটি নির্বাচন করে নাও।’

অশ্বেষণ চললো। আবিষ্কৃত হলো অভীক্ষিত এক কুমারী, রাজগৃহে যে সুন্দরীর সেরা। নাম শালবতী। তাকে প্রলুদ্ধ ও বশীভূত করা হলো। রাজার সাহায্যে তাকে গণিকাবৃত্তির উপযুক্ত সকল বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া গেলো। ওর জন্য নির্মিত হলো একখানা প্রমোদ ভবন। এর চারপাশে মনোরম পুষ্পাদ্যান, তৎপর সুদৃঢ় প্রাকার বেষ্টনী, সম্মুখে প্রমোদ-পুষ্করিণী, সিংহদ্বারে দ্বার রক্ষক, দাস-দাসি ইত্যাদি সকল প্রকার ভোগ বিলাসের এতো পরিপাটি করা হলো যে, রাজরাণীর চেয়ে শালবতী এখন কোনো অংশে কম নয়।

১ তিন ১

‘মহারাজ, ভয় হয় আপনাকে একটা কথা বলতে।’

‘অভয় দিচ্ছি পদ্মাবতী! নির্ভয়ে বলো।’

‘মহারাজ, বারবিলাসিনীদের ইচ্ছা নয় পুত্রের জননী হওয়া। তারা করে না পুত্র কামনা। এক্ষেত্রে যদি আপনি পুত্রের জন্মাদাতা হন, তাহলে কি করা যাবে?’

‘তোমার অভিলাষ ব্যক্ত করো।’

‘নৃপমণি, এ পুত্রের পোষক হবেন আপনি; জগতে পরিচয় দেবেন আপনিই তার জনক।’

‘তাই হবে পদ্মাবতী! নিশ্চিত হও তুমি। এটু বড়ো করে আমার নিকট পাঠিয়ে দিও ওকে।’

‘নরনাথ, কোন্ নিদর্শন দেখে ওর পরিচয় পাবেন?’

‘আমার নামাক্তিত এ অঙ্গুরীটি তুমি সযত্নে রেখে দাও, এটাই হবে ওর নিদর্শন।’ এ বলে নৃপতি বিম্বিসার তাঁর আঙ্গুল থেকে অঙ্গুরী মোচন করে পদ্মাবতীর হাতে দিলেন।

* * * * *

উজ্জয়িনী নগরী নরপতি চণ্ডপ্রদ্যোতের রাজধানী। তখন সেই নগরীতে রূপের পসরা খুলে জাঁকিয়ে বসেছিলো বারাজনা পদ্মাবতী। সে ছিলো রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের মানসপ্রিয়া ও অনুগ্রহীতা। তার বিলাস-ভবনে প্রবেশের অধিকার ছিলো-মাত্র রাজা, মহারাজ বা মহাধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের। তার অনিন্দ্য-সমুজ্জ্বল রূপ-মাধুরী আকর্ষণ করতো সকলকে। তার প্রাণ-মাতানো কোমল-মধুর কণ্ঠস্বর, জলতরঙ্গের মতো হাসির লহর, গণিকা-সুলভ মোহিনীমায়া, মধুময় সুরের আমেজ, ছন্দের দোলা, নৃত্যের হিল্লোল সকলকে বিভোর করে তুলতো।

মগধরাজ বিম্বিসার একদিন শুনলেন পদ্মাবতীর এসব গুণ-কাহিনী। শুনে চমৎকৃত হলেন তিনি; আকুল হয়ে পড়লেন ওর দর্শন মানসে। অচিরে নৃপতি পদ্মাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করলেন। এক রাত্রি পদ্মাবতীর

* * * * *

প্রাভাতিক দৃশ্য অতি মনোরম। প্রকৃতির শান্তভাব, প্রাণ-জুড়ানো শীতল-বায়ুর মধুর-স্পর্শ, বিহঙ্গের সুতান-লহরী, উদ্যানে শোভন-মোহন কুসুম নিচয়, পুষ্পের সৌরভ, ভ্রমরের গুঞ্জন, এসব প্রাণে যেন অমিয়-ধারা বর্ষণ করে।

মগধরাজ-আত্মজ অভয় কুমার প্রাতঃকালে বের হয়েছেন। আজ প্রভাতী-দৃশ্য তাঁর প্রাণে বড়ো আনন্দ দান করলো। প্রমোদ উদ্যানে ধীরে-মধুরে পদাচারণ করতে লাগলেন তিনি। কোথাও বা ক্ষণকাল অপেক্ষা করে নয়নানন্দময়ী অপূর্ব-শোভা সন্দর্শনে তন্ময় হচ্ছেন। ফুলের সুবাস, মধুপের গুঞ্জন-হৃদয় করলে রঞ্জিত, আকুল করলো প্রাণ। সুন্দর কুসুমনিচয় চয়ন করে মালা রচনা করলেন; সানন্দে তা' ধারণ করলেন কণ্ঠে। তারপর তিনি উদ্যান হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাজপথে অগ্রসর হলেন। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ অনতিদূরে দেখতে পেলেন-ঝোপের প্রান্তদেশে আবর্জনা রাশির উপর কয়েকটি কাক কি যেন পরিবৃত করে কা কা রব করছে। রাজকুমার কৌতূহলী হয়ে পার্শ্বচরকে বললেন-‘ওহে, দেখো দেখি, ওখানে কাকগুলো কি করছে।’

পার্শ্বচর গিয়ে যা' দেখলো, তা' তে হলো সে বিস্ময়াবিষ্ট। তখন সে দ্রুত হাতছানি দিয়ে বিস্ময়কণ্ঠে কুমারকে ডেকে বললো- ‘দেখুন, দেখুন কুমার, একটি নবজাত শিশু!,

কুমার আশ্চর্য হয়ে বললেন- ‘শিশু! নবজাত শিশু?’ ‘হ্যাঁ কুমার, নবজাত শিশু! আহাঃ, কি সুন্দর, লাল টুক টুকে; যেন সদ্য ফোটা গোলাপ ফুল!’

কুমার জিজ্ঞাসা করলেন- ‘জীবিত কি?’

হ্যাঁ, জীবিত। দিব্যি আরামে হাত-পা নেড়ে খেলছে।’

কুমার এসে বিস্ময়-নেত্রে দেখলেন-সত্যিই এক নবজাত শিশু। শিশুকে দর্শন মাত্র পুত্র-স্নেহের সঞ্চার হলো কুমারের অন্তরে। প্রাণ কেঁদে উঠলো শিশুর এমন দুরবস্থা দেখে। করুণায় হৃদয় হলো বিগলিত-দ্রবীভূত, চক্ষু হলো অশ্রুসিক্ত। করুণার্দ্র-কণ্ঠে বললেন তিনি-‘এমন

সোনার বরণ ছেলে, এভাবে এখানে কে রেখে গেলো? আহা, কী নির্মম, কী নিষ্ঠুর! যাও হে, শিশুটিকে নিয়ে যাও, আমার অন্তঃপুরে ধাত্রীর হাতে দিয়ে এসো। তা'কে বলে দিও- এ-কে যেন সযত্নে পালন করে।’

পার্শ্বচর শিশুটিকে নিয়ে দ্রুত প্রস্থান করলো। অন্তঃপুরে সে ধাত্রীর হস্তে শিশুকে সমর্পণ করতে করতে বললো-‘এ শিশু সযত্নে রক্ষার নিমিত্ত আপনার উপর রাজকুমারের আদেশ হয়েছে।

ধাত্রী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো-‘এমন সকাল বেলায় শিশু পেলেন কোথায়? কারই বা এ ছেলে?’

পার্শ্বচর তা'কে সকল কথা প্রকাশ করে বল্লো। তখন ধাত্রীর মর্মস্থল ভেদ করে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে পড়লো। বললো করুণার্দ্ৰ-কণ্ঠে-‘কোন পাষাণীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলে অভাগা!’ এ বলে ধাত্রী শিশুকে বক্ষে তুলে নিলো। ধাত্রীর প্রাণপণ যত্নে শিশু ক্রমশঃ বর্ধিত হতে লাগলো। ‘জীবিত কিনা’ অভয় কুমার একথা জিজ্ঞাসা করায়, শিশুর নামকরণ হলো ‘জীবক’। রাজকুমারের পোষ্য বলে তিনি ‘জীবক কৌমার পোষ্য’* [পালি গ্রন্থে ‘কুমার ভচ্চ’ লিপিবদ্ধ আছে; এর অর্থ-কুমার কর্তৃক ভরত, পালিত বা পোষিত। (মঃ নিঃ অঃ- পপঞ্চ সূদনী)] নামেই পরিচিত।

জীবক বর্ধিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ হলো সৌষ্ঠবপূর্ণ, ফুটে উঠলো উজ্জ্বল লাবণ্য, পুষ্ট-বলিষ্ঠ ও নীরোগ-শরীর, নয়নদ্বয় তেজোদীপ্ত, বুদ্ধি চমৎকার, সাহস অসীম, রাজপুত্রের মতোই তাঁকে শোভা পেতে লাগলো। বালক-স্বভাব-সুলভ চপলতা কথঞ্চিৎ বিদ্যমান থাকলেও, তাঁর বিনম্র-স্বভাব কিন্তু তা' প্রকাশ পেতে দেয় না। তাঁর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ শারীরিক শক্তির বিকাশ পেয়েছিলো। আশ্চর্যের বিষয়, কালে তিনি পঞ্চ হস্তীর বল ধারণ করেছিলেন।

কুমার অভয় জীবককে পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন। তাঁর সকল অভাব পূর্ণ করতেন তিনি মমতাময় অন্তরে। জীবকের ‘বাবা’ সম্বোধনে অভয়ের হৃদয়-কন্দর বাৎসল্য-রসে পূর্ণ হতো। তাঁকে দেখে প্রত্যেকেই মুগ্ধ

হতো, স্নেহ করতো, ভালবাসতো। রাজা বিম্বিসারও স্নেহের চক্ষে দেখতেন, 'নাতি' বলে আদর করতেন।

[জীবক অনুক্রমে কৈশোরকাল অতিবাহিত করলেন পরম সুখে। একদিন রাজপুরীর অন্যান্য বালকদের সহিত তিনি খেলা করছিলেন।

কোন কারণে তাদের সঙ্গে জীবকের মতানৈক্য ঘটলো। ক্রমে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হলো। বালকেরা সক্রোধে বললো- 'ওহে, যার মা-বাপের পরিচয় নেই, যে জারজ, তার কথা কতো আশ্চর্য্যনা!'

'জারজ' শব্দ শুনে উগ্রতেজা জীবক ক্রোধে হলেন অগ্নিশর্মা। তিনি রোষ-কষায়িত নেত্র বলে উঠলেন- 'রে দুর্ভাগারা, সাবধান হয়ে কথা বলিস্ ; আমি নই জারজ, জারজ তোরাই।'

তখন সকলেই বিদ্রূপ-হাস্যে বলে উঠলো- 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বটেই, আমরা জারজ বৈকি! তোকে ঝোপ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এনেছে কিনা, তাই আমরা হলেম জারজ।' এ বলে সবাই হোঃ হোঃ শব্দে হেসে উঠলো।

তেজস্বী জীবক ক্রোধে ঘৃণায় অপমানে মরমে মরে গেলেন। তাঁর শরীরে অসাধারণ শক্তি; ইচ্ছা হয়, এক এক মুষ্টিঘাতে সকলকে পঞ্চতুণ্ডাশ্রয় করায়। আবার সংযত হয়ে ক্ষুদ্রস্বরে বললেন- 'তোরা কি আমায় পাগল পেয়েছিস্?'

'না-না বাপু, তুমি পাগল নও, হাবা ছেল। আচ্ছা বাপু, বল দেখি- তোর বাবা কে, আর মা কে?'

'আমরা তো জানি না।'

'না জানলে তোদের বলেও কাজ নেই। তোদের মুখে যা আসে, তাই বল্; ঘৃণা হয়, তোদের সঙ্গে কথা বলতে। এই চললুম

বাবার কাছে, তাঁকে বলে তোদের শাস্তি দেওয়াবো।' এ বলে জীবক দ্রুত গমনে উদ্যত হলে, বালকেরা তাঁর গমনে বাধা দিয়ে বললো-

'আরে বাছা, এতো তাড়া কেন? যাবে আর কি, একটু দাঁড়া না বাপু, দয়া করে আর একটা কথা শুনে যা-না। আচ্ছা বলি- তোর মামার বাড়ি কোথা-রে? আমাদের মামার বাড়ি থেকে আমাদের জন্য কতো কি উপহার-দ্রব্য আসে, তোর জন্য তেমন কিছু আসে কি?'

তখন জীবকের সর্বশরীর ক্রোধে কম্পিত হচ্ছিলো। বললেন দৃষ্ট কণ্ঠে-
‘পথ ছেড়ে দে অভাগারা, তোদের সঙ্গে কোনো কথাই বলতে চাই না।’ এ বলে তিনি দ্রুত চলে গেলেন। পথে যেতে যেতে চিন্তা করলেন-
‘সত্যি তো, কোনো দিন তো মামার বাড়ি যাইনি, কা’কেও তো কোনো দিন মামা বলে ডাকিনি, মামার বাড়ি থেকে কোনো দিন কোনো উপহারও তো আসেনি, তবে কি এদের কথাই সত্য! আচ্ছা, গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখি।’ এরূপ চিন্তা করতে করতে জীবক বিষাদ-মনে অভয় কুমারের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁর গম্ভীর ও বিষণ্ণভাব দেখে কুমার সন্মোহে জিজ্ঞাসা করলেন-‘কি হয়েছে বাবা, তোমার এমন বিমর্ষ দেখছি কেন?’।

তাঁর স্নেহবাক্যে জীবকের চোখ সজল হয়ে উঠলো। বালক অভয়ের বক্ষে মুখ লুকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো। এ অনাথ বালকের কোন দুঃখ অভয়ের অসহ্য হতো। আজ ওঁর চক্ষে জল দেখে তিনি বড়ো ব্যথিত হলেন। স্নেহপূর্ণ সান্ত্বনা বাক্যে তিনি জীবককে শান্ত করে জিজ্ঞাসা করলেন-‘বাবা’ তুমি এমন করে কাঁদছো কেন?’ জীবক বাস্পরুদ্ধকণ্ঠে বললেন- ‘বাবা’, ছেলেগুলো আমার অপমান করেছে। ‘কি অপমান করেছে?’

‘ওরা কি না বলে, আমার মা নেই, বাবা নেই, আরো বলে কি-আমি জারজ! ওরা আমায় অমন বলবে কেন বাবা?’

জীবকের বেদনাপূর্ণ কথাগুলি শুনে কুমার যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা-জীবক হতে এসব কথা যেন গোপন থাকে। কিন্তু, পারা গেলো কই। আজ হঠাৎ ওঁর এরূপ প্রশ্নের যে কি উত্তর দেবেন এবং কি বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেবেন, সহসা তিনি কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলেন না। জীবক অভয় কুমারকে নীরব দেখে অধীর হয়ে বললেন- ‘হ্যাঁ বাবা, তবে কি ওরা সত্য-কথাই বলেছে?’

তিনি সন্মোহে বললেন-‘বাবা, ওরা যা’ বলবে বলুক, তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না।

জীবক সজলনেত্রে ব্যগ্রতার সহিত বলে উঠলেন-‘না বাবা, ওসব বলে

আমার ভোলাবার চেষ্টা করবেন না। ওসব কথা ছেড়ে দিন, আমার মা কে, আর বাবা কে হন, খুলে বলুন।’

জীবকের ব্যাকুলতা দেখে অভয় কুমার আর না বলে পারলেন না। তিনি বাৎসল্যপূর্ণ স্বরে বললেন-‘বৎস, তোমার মা কে, তা’ আমি জানি না; তবে আমি তোমায় পালন করেছি বলে আমি তোমার পালক-পিতা মাত্র। বাবা, তজ্জন্য তোমার দুঃখ করার বা ভাবনার কোনো কারণ নেই। তুমি তো রাজপুত্রের মতো রাজপরিবারেই আছো, কোনো দিন তো কোনো অভাব অনুভব করো নি; ভবিষ্যতে আমার উত্তরাধিকারী তো তুমিই,* [অভয় কুমার পরে অবগত হয়েছিলেন, জীবক তাঁর ঔরস-জাত সন্তান। (মঃ নিঃ অঃ পপঞ্চ সুদনী)] তোমার আবার চিন্তা কিসের? যাও বাবা, তুমি খেলো গিয়ে, যারা তোমায় অন্যায় বলেছে, তাদের আমি শাস্তি দেবো।’

অভয় কুমারের কথা শুনে জীবকের মস্তকে যেন বজ্রপাত হলো। তাঁর উজ্জ্বল কান্তিময় আনন পাংশুবর্ণ ধারণ করলো। তাঁর বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ হলেও, বয়সানুপাতে তাঁর জ্ঞানশক্তি কিঞ্চিৎ অত্যধিক প্রখর। তাঁর যে ভাঙা কপাল, এ তিনি প্রকৃষ্টরূপেই বুঝতে পারলেন। এতদিন তিনি নিজকে যতদূর মনে করে আসছেন, তা’ যেন শূন্যতায় বিলীন হয়ে গেলো। এখন তাঁর মনে হচ্ছে- তিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তৃণ হতেও তুচ্ছ। দিগন্ত-প্রসারী মহা-সমুদ্রে তিনি যেন পরমাণু-কীট। তাঁর দু’গুণ বেয়ে ঝরতে লাগলো অশ্রুবিন্দু। ভীষণ ঝঞ্ঝায় মথিত হচ্ছে যেন তাঁর অন্তঃকরণ। তাঁর উদাস-দৃষ্টি, ব্যথিত আনন ও গম্ভীরভাব দর্শনে অভয় কুমার উপলব্ধি করলেন- জীবকের অন্তরে তীব্র-আঘাত লেগেছে। তিনি স্নেহবাক্যে অনেক প্রবোধ দেবার প্রয়াস পেলেন বটে, কিন্তু জীবকের অন্তর কিছুতেই সে প্রবোধ মানলো না।

জীবক বুঝতে পারলেন-তিনি অনাথ, সংসারে আপনার বলতে কেউ নেই। তিনি যেন অসীম-সমুদ্রে ভাসমান অনির্দিষ্ট ভেলা। মধ্যে মধ্যে তাঁর চিন্তাধারা বহুমুখী হয়ে প্রবাহিত হয়-‘আমি কে? কোথা থেকে এলাম? মা কে, বাবা কে? সদ্য-শিশু, সে তো কোনো অপরাধ করতে

জানে না, তবে কেন পরিত্যক্ত হলো? তখন মৃত্যু হওয়াই তো ছিলো বাঞ্ছনীয়।' এরূপ চিন্তা করতে করতে তাঁর চতুর্দিকে যেন বিরাট-শূন্যতা পরিলক্ষিত হয়। অবিরল ধারায় প্রবাহিত হয় নয়নবারি। ধিক্কার আসে জীবনের প্রতি। ইচ্ছা হয়, আত্মহত্যা করে এ কলঙ্কিত জীবনের অবসান করেন। আবার ভাবেন-‘আত্মহত্যা মহাপাপ’।

অনাথ বালক জীবক আপন ভবিষ্যৎ চিন্তায় বিভোর হলেন- ‘আমি কি করবো? কোন্ পন্থা অবলম্বন করবো? কিরূপেই বা হবো জগৎ-বরণ্য? এমন একটা উপায় নির্ধারণ করতে হবে-অর্জন করতে পারি যেন সুনাম-সুখ্যাতি, শ্রেষ্ঠত্বে হই যেন উপনীত, চিরতরে অক্ষুণ্ণ থাকে যেন গৌরব-মহিমা।

‘রাজপুরী বড়ো বিপজ্জনক। আমি একজন অজ্ঞাত-কুলশীল। আজ রাজপরিবারে অবস্থান করলেও এমন একদিন আসতে পারে, সামান্য কারণেও হয়তো নিঃস্ব হয়ে পথে দাঁড়াতে হবে। যতো দিন আমি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে না পারি, উন্নত হতে না পারি, নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড় করতে না পারি, ততোদিন এ-রাজসংসার থেকে দূরেই অবস্থান করবো।’

জীবক অনেক চিন্তার পর আঠার প্রকার শাস্ত্র ও চৌষটি প্রকার কলাবিদ্যা পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন-এক সরস অনবদ্য-জীবিকা; বা’ পাপবর্জিত ও নিষ্কলঙ্ক-‘চিকিৎসাবিদ্যা।’ সুতরাং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রই শিক্ষা করতে হবে। তা’ শিক্ষার জন্য তিনি আকুল হয়ে উঠলেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট তিনি জ্ঞাত হলেন-তক্ষশিলাই সর্বশাস্ত্র শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও তথায় উত্তমরূপে শিক্ষা করা যায়। তক্ষশিলার নাম শোনামাত্রই জীবকের চিত্ত তৎপ্রতি হলো আকৃষ্ট। তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে কে যেন বলে দিচ্ছে-‘তোমার বাঞ্ছিতরত্ন প্রসবিনী ক্ষেত্র একমাত্র তক্ষশিলা।’ জীবকের একান্ত প্রতীতি জন্মালো-তথায় হবে তাঁর বাসনা ফলবতী। তাই তক্ষশীলা যাবার জন্য আকুল হলেন তিনি।

৷ পাঁচ ৷

সুপ্রসিদ্ধ তক্ষশিলা নগরী গান্ধার রাজ্যের রাজধানী। উহা বিদ্বানমণ্ডলীর আবাস-ক্ষেত্র। বিশ্ববিশ্রুত বিদ্যাপীঠই গরীয়সী করে তুলেছিলো তক্ষশিলাকে। তখনকার দিনে যতবড় পণ্ডিতই হোক না কেন, যিনি তক্ষশিলার বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভ করেননি, তেমন পণ্ডিতের কোনও সমাদর ছিল না। শিক্ষায় উন্নত হতে হলে এবং সর্বোচ্চ উপাধি-ভূষিত হয়ে খ্যাতি অর্জনের ইচ্ছা করলে তক্ষশিলার বিদ্যাপীঠেই শিক্ষালাভ করতে হতো।

গ্রীস, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, দাক্ষিণাত্য, মিথিলা, মগধ, কোশল ও বৈশালী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেশ থেকে বিদ্যার্থীরা বিবিধ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানার্জন মানসে এই তক্ষশিলার বিদ্যামন্দিরেই উপনীত হতেন। এখানে বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, পুরাণ, ন্যায়, স্মৃতি, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ, অর্থ, তর্ক, ছন্দ, অলঙ্কার, গজ ও লক্ষণশাস্ত্র প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্রবিষয়ে শিক্ষাদান হতো। রাজা, রাজাধিরাজ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সন্তানগণও এ বিদ্যায়তনে শিক্ষালাভ করতেন। এর সুযশঃ-সুখ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিলো। এখনও তক্ষশিলা-বিদ্যাপীঠের গৌরবময় কীর্তিকলাপ পৃথিবীর ইতিহাসে অমর-অক্ষরে দেদীপ্যমান। এমন সময় তক্ষশিলা হতে কয়েকজন বণিক কোনো কার্যোপলক্ষে রাজগৃহে এসেছিলো। একদিন তারা অভয়কুমারের সহিত সাক্ষাৎ মানসে রাজভবনে উপস্থিত হলো। তাদের সহিত জীবকের আলাপ-পরিচয় হলো। তিনি অনুরোধ করলেন, তারা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সময়ে তাঁকেও যেন সঙ্গে নিয়ে যায়। তারাও সম্মত হলো। তা' স্থিরীকৃত হলো গোপন পরামর্শে।

এক শুভ মুহূর্তে জীবক সকলের অগোচরে বণিকদের সহিত রাজগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। আজ অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হলো তাঁর অন্তরে। চতুর্দিকের দৃশ্যাবলীও যেন নূতনত্বে সেজে তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছে- 'জীবক, যেখানে যাচ্ছে, সেখানেই সন্ধান মিলবে রত্ন-ভাণ্ডারের, সেখানেই রয়েছে তোমার বাঞ্ছাকল্পতরু।'

যথাসময় জীবক উপনীত হলেন তক্ষশিলার বিদ্যাপীঠে। সুবিশাল

বিদ্যায়তন; বহুপ্রকোষ্ঠে সুবিভক্ত; শত শত শিক্ষার্থী; অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অধ্যাপনায় ব্যাপ্ত। রাজপুত্র, সেনাপতিপুত্র, মুনিপুত্র, ধনাঢ্যের পুত্র ও দরিদ্রের পুত্র একসঙ্গেই পরস্পর সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে বিদ্যার্জন করছে। আয়ুর্বেদ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আত্রেয় সন্নিধানে জীবক উপস্থিত হলেন। তাঁকে সভক্তি অভিবাদনাস্তে তিনি বিনীত-বাক্যে নিবেদন করলেন- ‘আচার্যপ্রবর, আপনার নিকট আমি শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা করেছি।’

জীবকের কান্তিময় দেহ দেখে আত্রেয় প্রীত হলেন। তাঁকে দেখেই আচার্যের অন্তরে স্নেহের সঞ্চারণ হলো। ‘কী সুন্দর ছেলে, কতো নম্র স্বভাব, কেমন মধুর আলাপ! কার এ ছেলে?’ চিন্তা করলেন মহাপণ্ডিত আত্রেয়। সন্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন-‘বৎস, তুমি কোথেকে এসেছো? কার বা ছেলে?’

বুদ্ধিমান জীবক নিজের সম্যক পরিচয় না দিয়ে স্বচ্ছন্দ-কণ্ঠে বললেন- ‘দেব, আমি রাজগৃহ থেকে এসেছি। আমি মগধরাজ বিন্ধিসারের পৌত্র, অভয় রাজকুমারের পুত্র।

আচার্য প্রসন্ন বদনে বললেন-‘তাই তো বৎস, রাজপরিবারের ছেলে না হলে, এমন সন্তান লাভ করা কি সকলের ভাগ্যে ঘটে?’

আচার্যের কথায় জীবক অত্যধিক সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হয়ে পড়লেন। ‘বৎস, তুমি এখানে নির্বিবাদে শিক্ষা করতে পারবে; কোন বিষয় শিক্ষা করতে চাও?’ জিজ্ঞাসা করলেন আত্রেয়।

‘গুরুদেব, আমি চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা করতে চাই। আপনাতো মহতের অনুকম্পায় যদি আমার বাসনা ফলবতী হয়।’

‘বৎস, তুমি অতি সুকোমল, চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ত্ত্ব করা অতি কষ্টসাধ্য, তা’ পারবে?’

‘গুরুদেব, নিশ্চয়ই পারবো; যদূর কষ্টসাধ্যই হোক না কেন, তজ্জন্য আমার জীবন পণ করবো।’

জীবকের দৃঢ়-সঙ্কল্প ও মধুরালাপে আচার্য আত্রেয় অতি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন-‘বৎস, অতি উত্তম, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র শিক্ষা করার একান্ত যদি ইচ্ছা করে থাকো, তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে।

॥ ছয় ॥

তক্ষশিলা বিদ্যাপীঠে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই শিক্ষার সুযোগ লাভ করতো; বিদ্যাপীঠের এও একটা গৌরবময় অবদান। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ধনীর সন্তান, তাদের শিক্ষা করতে হতো যথোপযুক্ত ধন দিয়ে। আর যারা দরিদ্র, তাদের সেখানকার কাজ-কর্ম ও আচার্যের সেবা-শুশ্রূষা করে শিক্ষা করতে হতো। আচার্য আত্রেয়ের দয়ায় জীবককে তেমন কিছুই করতে হলো না। তিনি এই বিনীত নূতন শিক্ষার্থীকে ধর্মান্বেবাসী-রূপে গ্রহণ করে নিলেন। আচার্য তাঁকে শিক্ষা দিতে লাগলেন পুত্রবৎ স্নেহ ও প্রাণপণ যত্নে। জীবকও আচার্যের যথাযোগ্য সেবা-শুশ্রূষাদি করে অত্যধিক উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে শিক্ষাকার্যে সম্পাদনে ব্যাপ্ত হলেন।

প্রগাঢ় ধীশক্তিমান জীবক শিক্ষাকার্যে অগ্রসর হতে লাগলেন অতিদ্রুত। আচার্য প্রথম তাঁকে পাঠ অল্প দিয়েও দেখলেন, বহু দিয়েও দেখলেন। যা'ই দেওয়া হয়, তা'ই তিনি অনর্গল কণ্ঠস্থ করে ফেলেন। পাঠ্য-বিষয় অতি উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করে নেন; যা হৃদয়ঙ্গম করা হয়, আর বিস্মৃত হন না।

আচার্য চমৎকৃত হলেন তাঁর স্মৃতিশক্তির প্রাচর্য দর্শনে। তিনি অধিকতর উৎসাহিত হয়ে তাঁকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে লাগলেন। জীবকের জন্য তাঁকে কোনও বেগ পেতে হলো না। কারণ, জীবক ছিলেন বিচক্ষণ বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন। তাই আচার্যের বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝে নিতেন এর যথাযথ ভাবার্থ।

এরূপে জীবক সাত বৎসর যাবৎ শিক্ষা লাভ করলেন, কিন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অন্ত নির্ণয় করতে পারলেন না। এ শাস্ত্র আচার্যের যতদূর অধিগত আছে, যা' অন্য কারো শিক্ষা করতে ষোল বৎসরের প্রয়োজন, জীবক তা' সমাপ্ত করলেন সাত বৎসরে।

জীবকের শিক্ষাকালীন দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তা করলেন-‘এই জীবক এক সময় বুদ্ধের বিশ্বস্ত সেবক হবেন এবং বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের হবেন চিকিৎসক। সুতরাং একে কর্মজ-ব্যাপি ব্যতীত সর্ব-রোগহর এক

ভৈষজ্য-যোজনা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।’ এ চিন্তার পর দেবেন্দ্র আচার্যের শরীরে অধিষ্ঠিত হয়ে অশ্রুতপূর্ব ভৈষজ্য-যোজনার আশ্চর্য প্রণালী শিক্ষা দিলেন। এই দেবানুভাব সম্বন্ধে জীবক অথবা আচার্য কেহই কিছু অনুভব করতে পারলেন না। জীবক সবিস্ময়ে চিন্তা করলেন- ‘কী আশ্চর্য’ সর্ব ব্যাধিহারক এমন চমৎকার ঔষধ-যোজনা সম্বন্ধেও তো আচার্যের অভিজ্ঞতা আছে দেখছি! তাঁর কী গবেষণা, কী গভীর জ্ঞান!,

দেবরাজ যখন আচার্যের শরীর ত্যাগ করে প্রস্থান করলেন, তখন আচার্যও এ চিন্তা করে আশ্চর্যবোধ করলেন যে- ‘কি রূপে আমি শিক্ষা দিলাম এমন অপূর্ব ঔষধ-যোজনা, যা’ আমার জ্ঞানাतीত ও কল্পানাतीত; নিশ্চয়ই ইহা দেবতার দান!’ এবার জীবকের ধারণা হলো দৃঢ়তর-চিকিৎসা-শাস্ত্রে তিনি অর্জন করেছেন বিশেষ অভিজ্ঞতা। যে কোনও জটিল-রোগ অম্লিয়াসেই আরোগ্য করার ক্ষমতা জন্মেছে অসাধারণ। অনন্তর তিনি আচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন-‘গুরুদেব, আজ সাত বৎসর ব্যাপী শিক্ষাকার্যে ব্যাপ্ত আছি। স্বল্পপাঠও নিয়েছি, বহুপাঠও নিয়েছি, গৃহীত পাঠ উত্তমরূপেই ধারণ করেছি। যা’ একবার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, তা’ আর বিস্মৃত হইনি, তবুও সাত বৎসরেও শিক্ষার অন্ত দেখা যাচ্ছে না, কবে এর অন্ত হবে?’

আচার্য বললেন-‘তা’ হলে বৎস, একখানা খনিত্র নিয়ে বিদ্যাপীঠের চারধারে এক এক যোজনব্যাপী স্থান অন্বেষণ করে দেখে, তৃণ-লতা ও গাছ গাছড়ার মধ্যে যা’ ভেষজ নয়, তা’ আমার নিকট নিয়ে এসো। জীবক খনিত্র-হস্তে বের হলেন। আচার্যের নির্দেশিত স্থানে চার দিন যাবৎ বিচরণ করে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন-ভেষজ নয়, এমন কিছু তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো না। অগত্যা তিনি আচার্যের নিকট প্রত্যাবর্তন করে বললেন-‘গুরুদেব, আপনার আদিষ্ট স্থানে অনুক্রমে অনুসন্ধান করে দেখলাম- ভেষজ নয়, এমন কিছুই পেলাম না।

তখন মহাপণ্ডিত আত্রেয় প্রসন্ন-হাস্যে বললেন-‘বৎস জীবক, তুমি চিকিৎসা-শাস্ত্র যা’ শিক্ষা করছো, তা’ অতি উত্তমরূপে শিক্ষা হয়েছে।

এতেই তোমার যথেষ্ট হবে। এখন ইচ্ছা করলে তুমি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।’

‘হ্যাঁ গুরুদেব আমার যাবার ইচ্ছাই হয়েছে’

‘ভালো বৎস, তোমার যখন ইচ্ছা হয়, তখন যেতে পারো।’

আত্রেয় চিন্তা করলেন-‘জীবক রাজকুলের সন্তান। রাজপুরী বিলাস-ব্যসনে পরিপূর্ণ। সে এখান থেকে গিয়ে ভোগ-বিলাসে মগ্ন হলে, আমার এবং চিকিৎসার মহিমা কিছুই উপলব্ধি করতে পারেন না। সুতরাং ওকে স্বল্প পাথেয় দেওয়াই সমীচীন হবে, তা’ যেন অর্ধপথে শেষ হয়ে যায়। পাথেয়ের অভাব হলে যে কোনো স্থানে চিকিৎসা করে অর্থ সংগ্রহ করতে বাধ্য হবে। তখন বুঝবে আমার ও চিকিৎসার গুণ-মহিমা।’

জীবকের বিদায়কালে আচার্য তাঁকে স্বল্প পাথেয় দিয়ে বললেন- ‘বৎস, তুমি এই স্বল্প পরিমাণ পাথেয় নিয়ে যাও। পথে অর্থের অভাব হলে, তোমার বিদ্যা উপযুক্ত স্থানে কাজে লাগাবে, তবে আর কোন অভাব হবে না।

জীবক সজল-নেত্রে আচার্যের পদধূলি মস্তকে নিয়ে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি ক্রমশ গিয়ে সাকেত নগরে উপনীত হলেন। তখন নিঃশেষ হলো তাঁর পাথেয়। সম্মুখে রয়েছে জনা-মানবশূন্য সুদীর্ঘ অরণ্য-পথ। পানীয় জল ও খাদ্য-ভোজ্যের অভাব। এই দুর্গম অরণ্য কান্তারপথ নিঃস্ব অবস্থায় অতিক্রম করা সম্ভব নয়। জীবক চিন্তাম্বিত হলেন। অগত্যা তিনি পাথেয় সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন।

* * * * *

সকেত নগরে জনৈক শ্রেষ্ঠী-পত্নী সাত বৎসর যাবৎ শিরঃপীড়ায় অসহ্য-যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। বহু প্রসিদ্ধ চিকিৎসক যথাশক্তি চিকিৎসা করলেও, ও এ দুরন্ত ব্যাধির উপশম হলো না। শ্রেষ্ঠীপত্নী বহু চেষ্টা ও অজস্র অর্থ-ব্যয়েও যখন ব্যাধিমুক্ত হলেন না, তখন এটাই প্রতীয়মান হলো যে- মৃত্যু ব্যতীত এ রোগ উপশম হবার নয়। এ উৎকট রোগ-যন্ত্রণা তাঁর অসহ্য হলো; সারাক্ষণ তিনি কেবল মৃত্যু-কামনাই করতে লাগলেন।

এমন সময় জীবক অন্বেষণ করছেন উৎকট-ব্যাধিগ্রস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি। সাকেত নগরের লোকদের নিকটও জিজ্ঞাসা করলেন, কোন ব্যাধিগ্রস্ত লোক আছে কিনা? তিনি ইহাও প্রকাশ করলেন-যে কোন জটিল-ব্যাধি হোক, তিনি ব্যাধিমুক্ত করতে সমর্থ। তখন সকলেই বললো শ্রেষ্ঠীপত্নীর কথা এবং অনুরোধও করলো তাঁকে চিকিৎসা করার জন্য। জীবকের অর্থের প্রয়োজন, তাই আজ বিনা আত্মহানি তিনি শ্রেষ্ঠীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হতে বাধ্য হলেন। দৌবারিককে বললেন-‘ওহে, তুমি, শ্রেষ্ঠী-পত্নীকে বলো গিয়ে-একজন কবিরাজ এসেছে, সে তাঁকে দেখতে চায়।’

সে গিয়ে শ্রেষ্ঠী-পত্নীকে এ কথা বললে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন-‘কবিরাজের বয়স কতো?’

‘চব্বিশ কি পঁচিশ বছর হবে।

তা শুনে নিরুৎসাহ হলেন তিনি। বললেন অবজ্ঞা-মিশ্রিত কণ্ঠে-‘দ্বারপাল, নিঃপ্রয়োজন। এ ছেলেমানুষ আমায় কি করবে? কতো বৃদ্ধ অভিজ্ঞ চিকিৎসক কিছুই করতে পারলো না, কেবল নিয়ে গেলো অজস্র অর্থ, এ বালক আর কী বা করবে? বাজে লোকের ওষুধ খেতে আর ইচ্ছা নেই?’

দ্বারপাল গিয়ে এসব কথা জীবককে জানালে, তিনি হেসে বললেন-‘তুমি আবার গিয়ে বলো যে, রোগারোগ্য না হলে, আমায় কিছু দিতে হবে না, নীরোগ হলে যা’ ইচ্ছা হয় দেবেন।’

দৌবারিকের মুখে একথা শুনে রোগিনী অনুমতি দিলেন-‘তা হলে আসতে বলো?’

জীবক তৎসমীপে উপস্থিত হলে, তাঁকে দেখে তিনি বললেন-‘তুমি ছেলে মানুষ তোমার জ্ঞানই বা কতো, তুমি কি করতে পারবে বলো? জীবক তদুত্তরে বললেন-‘মা, বিদ্যার নিকট বয়সের নবীনত্ব বা প্রাচীনত্ব নেই, বয়স বেশি হলেই যে জ্ঞান বেশি হয়, তা’নয়। আপনার রোগোপশমই প্রয়োজন, বয়স দিয়ে কি করবেন মা?’ জীবকের কোমল-মধুর ও জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে রোগিনী অতীব প্রসন্ন ও আশ্বস্ত হলেন। তিনি মৃদু হেসে বললেন-‘তোমার কথা তো বেশ চমৎকার ও বুদ্ধি-পরিচায়ক! তুমি কি আমায় আরোগ্য করতে পারবে?’

‘আরোগ্য করতে না পারলে, আমি তো ‘কিছুই নেবো না’ এ কথা পূর্বেই বলে দিয়েছি। দু’একটা ঔষধ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখি, আপনাকে রোগ-মুক্ত করতে পারি কিনা।’ এ কয়েকটা কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রোগিনীর রোগের লক্ষণ সমূহ পর্যবেক্ষণ করলেন, তৎসঙ্গে ব্যাধির মূল কারণ জ্ঞাত হয়ে বললেন-মা’ এক ছটাক ঘৃতের প্রয়োজন।’ তখনি ঘৃত এনে দেওয়া হলো। ঘৃতের সহিত বিবিধ ঔষধ মিশ্রিত করে পাক করা হলো। অতঃপর উত্থান হয়ে শায়িত অবস্থায় রোগিনীর নাসারন্ধ্রে তা’ প্রবেশ করিয়ে দিলেন। প্রবিষ্ট ঘৃত মুখ দিয়ে বের হয়ে এলো। মুখ থেকে তা’ মাটিতে ত্যাগ করে দাসিকে আদেশ করলেন-দাসি, এ ঘৃতটুকু কার্পাস-তুলায় তুলে নে।’

শ্রেষ্ঠী-পত্নীর এরূপ আদেশ শুনে জীবক সবিষ্ময়ে চিন্তা করলেন ‘কি আশ্চর্য, এমন জঘন্য-নীচমনা গৃহিণী তো আর চোখে পড়েনি! এমন ঘৃণিত-উচ্ছিষ্ট ঘৃতও তুলে নিতে বলছে! এরূপ কৃপণ-মেয়ে যে আমায় কিছু দেবে, তা’তো মনে হচ্ছে না।’

বুদ্ধিমতী গৃহিণী জীবকের চোখ-মুখের অবস্থা দেখে তাঁর মনোভাব বুঝে নিলেন। তিনি মৃদু-হেসে জিজ্ঞাসা করলেন-‘কি বাছা, এমন বিমনা হলে যে?’

জীবক অপ্রতিভ ও লজ্জিত হয়ে বললেন-‘না মা, তেমন কিছু নয়।’

‘বলো না বাবা, আমি যে তোমার মায়ের মতো, লজ্জা কিসের। নিশ্চয়ই তুমি অন্যথা কিছু মনে করছো।’

অগত্যা জীবক বললেন-‘অন্যথা কিছু নয় মা, যা একান্ত ত্যাগের, তেমন অপবিত্র-ঘৃত কেন তুলে নেওয়ালেন, তা’ বুঝতে পারিনি।

মহিলা ধীর-কণ্ঠে বললেন- ‘বাছা, তুমি ছেলে মানুষ, গৃহী নীতি এখনও বোঝনি। গৃহীদের সামান্য বিষয়েও অবহেলা করতে নেই। অতি তুচ্ছ-বস্তু হতেও মহৎ-কাজ সাধিত হয়। চিন্তা করে দেখো-এ ঘৃত অতি হেয় হলেও, একদিন হয়তো দাস-দাসীর পা মাজতেও লাগতে পারে, অথবা প্রদীপ জ্বালান-কাজও চলতে পারে। ফেলে দিয়ে লাভ কি বলো তো? তা’ই বলে বাবা, তোমার প্রাপ্য সম্বন্ধে কোনও অন্যথাভাব পোষণ করো না; পারিশ্রমিকের ব্যতিক্রম ঘটবে না।’ এসব কথা শ্রেষ্ঠীপত্নী অতি আহলাদের সহিত বললেন। কারণ, তাঁর দুঃসহ জটিল-ব্যাধি জীবকের এক নস্যেই উপশম হয়েছে। দীর্ঘ সাত বৎসর পরে রোগমুক্ত হয়ে আজ তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাই তাঁর অন্তরে এখন অফুরন্ত আনন্দের সঞ্চার হয়েছে। এত শান্তি-সুখ যেন জীবনে আর কোন দিন উপভোগ করেননি। ইচ্ছা হলো-আপন বলতে যা’ কিছু, সবই তাঁর জীবন-দাতার হাতে সমর্পণ করে দেন, তবুও যেন মনে হচ্ছে- এর যথাযথ প্রতিদান দেওয়া হবে না।

গৃহকর্ত্রীর আরোগ্য লাভে পরিবারস্থ সকলেই আনন্দিত হলো। তিনি সানন্দে জীবককে প্রদান করলেন- চার হাজার স্বর্ণমুদ্রা। মাতার আরোগ্যে পুত্র সন্তুষ্ট হয়ে দিলেন চার হাজার, পুত্রবধূ চার হাজার এবং শ্রেষ্ঠী দিলেন চার হাজার স্বর্ণমুদ্রা, আরো দিলেন দাস-দাসি ও অশ্বরথ।

ভাগ্যবান জীবক প্রথম চিকিৎসা-যাত্রায় লব্ধ ষোড়শ স্বর্ণ-মুদ্রা, দাস-দাসি ও অশ্বরথ সঙ্গে নিয়ে যথাসুখে রাজগৃহে উপনীত হলেন। রাজপুরীতে পৌঁছেই প্রথম সাক্ষাৎ করলেন তাঁর পালক পিতা অভয় কুমারের সহিত। পিতা-পুত্রের দেখা হলো আজ সাত বৎসর পরে। অভয় আনন্দে অধীর হয়ে জীবককে বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দাক্ষতে তাঁর গণ্ডস্থল প্লাবিত হলো।

জীবক পিতার পদধূলি মস্তকে ধারণ করে বললেন-‘পিতঃ, আমি প্রথম চিকিৎসা-কর্মে ষোড়শ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, দাস-দাসি ও অশ্বরথ লাভ করেছি। আপনি আমার জীবন-দাতা; আমাকে লালন-পালন করতে অনেক কষ্ট-স্বীকার করেছেন। সে’ঋণ অপরিশোধ্য; আমার জীবন বিনিময়েও নয়। সুতরাং পিতঃ, আপনার সেই মহদুপকার স্মরণ করে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ সম্প্রতি আমার প্রথম লব্ধ এসব স্বর্ণমুদ্রা, দাস-দাসি ও অশ্বরথ আপনাকে দিচ্ছি, আপনি অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করলে আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করবো।’

অভয় কুমার প্রসন্ন-হাস্যে জীবককে বললেন- ‘বৎস, সম্ভ্রষ্ট হলাম, তোমার কর্মের পুরস্কার তোমারই হোক। তোমার কৃতিত্ব - গৌরবে অপার আনন্দ অনুভব করছি আমি। আমার পক্ষে এটাই যথেষ্ট লাভ। আমার একমাত্র কামনা-তোমার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক। এ অর্থ-ব্যয়ে আমাদের অন্তঃপুরেই তোমার আবাস-গৃহ নির্মাণ করে নাও। অতঃপর অচিরেই অন্তঃপুরে জীবকের বাসগৃহ নির্মিত হলো।

। সাত ।

তখন মহারাজ বিম্বিসার ভগন্দর রোগে দুঃসহ দুঃখ ভোগ করছিলেন ক্ষতস্থান থেকে রক্তস্রাব হয়ে রঞ্জিত হয় পরিধেয় বস্ত্র । তদর্শনে মহিষীরা পরিহাস বাক্যে বলতেন-‘আমাদের রাজা পুষ্পবতী হয়েছেন, অচিরেই প্রসব করবেন মনে হয় ।’ রাণীদের এমন বিদ্রূপ-বাক্যে রাজা অত্যধিক লজ্জিত ও দুঃখিত হতেন । প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের বহুচেষ্টা সত্ত্বেও যখন আরোগ্য লাভ করলেন না, তখন তাঁর আর দুঃখের অবধি রইলো না । একেতো রোগ-যন্ত্রণা, তদুপরি আবার রাণীদের বিদ্রূপ-বাক্যে রাজার অসহ্য হয়ে উঠলো ।

একদা তিনি অভয় কুমারকে আদেশ করলেন- ‘অভয়, রোগের যন্ত্রণায় আমি অতিষ্ঠ হয়েছি, পরিধেয় বস্ত্র রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে । এ রোগের যে’ বৈদ্য খুব নামকরা, তাকে অনুসন্ধান করে তুমি নিয়ে এসো ।’

কুমার নিবেদন করলেন-‘বাবা, জীবক তরুণ হলেও নিপুণ, সে খুব ভদ্র ও অমায়িক । সে-ই আপনার চিকিৎসা করবে ।’

‘ভালো, তাকে আসতে বলো ।’

অভয় কুমার জীবককে তা’ বললেন এবং মহারাজকে চিকিৎসা করতে আদেশ করলেন । পিতৃ আদেশে জীবক নখের মধ্যে যৎসামান্য ওষুধ রেখে রাজসমীপে উপনীত হয়ে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনান্তে বললেন- ‘মহারাজ আপনার রোগের অবস্থাটা একবার দেখতে চাই ।’ এ বলে তিনি রাজার ক্ষতস্থান দেখতে লাগলেন এবং তৎসঙ্গে ওষুধও লেপন করে দিলেন । কিন্তু, নৃপতি এর কিছুই জানতে পারলেন না । সেই এক প্রলেপেই তাঁর রোগ উপশম হয়ে গেলো । এতে রাজা আশ্চর্যান্বিত হলেন । কখন যে প্রয়োগ করা হলো ওষুধ, আর রোগমুক্ত হলেনই বা কিরূপে, এর কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না । তা’ যতই চিন্তা করেন, ততই তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন । জীবকের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন তিনি । এই তরুণ-বৈদ্যের প্রতি নরেন্দ্র অত্যধিক প্রসন্ন হলেন । তিনি যথাসত্বর জীবককে পুরস্কৃত করার ইচ্ছায় পঞ্চাশত রাণীকে হীরা-মুক্তা খচিত বহুমূল্য অলঙ্কার সম্ভারে বিভূষিত করতে যত

অলঙ্কারের প্রয়োজন, সে' পরিমাণ অলঙ্কার রাশিকৃত করে জীবককে সাদরে বললেন-‘জীবক, আমাকে চিকিৎসা করার পুরস্কার স্বরূপ এই অলঙ্কার রাশি গ্রহণ করো।’

জীবকের একান্ত ইচ্ছা-মাত্র রাজার সেবা করা। এতেই হতে চান তিনি নৃপতির বিশ্বাস ও অনুগ্রহ ভাজন। তাই এ অলঙ্কারের লোভ তাঁর চিন্তকে গ্রাস করতে পারলো না। তাঁর প্রখর-জ্ঞান ও বিচার শক্তির প্রভাবে এটাও তিনি বিশেষ ভাবে অবগত আছেন যে, যে কোনও কারণে তাঁর প্রতি রাজা রুষ্ট হলে, অচিরেই তাঁকে রাজপুরী ত্যাগ করতে হবে। শিশুকাল থেকে যে'স্থানে তিনি বর্ধিত হয়েছেন, সে'স্থানের প্রতি তাঁর অগাধ মমতা; যাঁরা তাঁর জীবন-দাতা; যাঁদের স্নেহ, ও করুণায় লালিত পালিত হয়ে আজ এমন গৌরবময় কীর্তি-সৌধ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁদের থেকে কি করে গ্রহণ করতে পারেন এহেন পারিতোষিক। তাই তিনি প্রত্যাখান সূচক বিনীত-বাক্যে বল্লেন-‘দেব, আপনি যে আমার চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হয়ে পুরস্কৃত করবার ইচ্ছা করেছেন, এতেই পরিলক্ষিত হচ্ছে-আমার প্রতি আপনার অসীম স্নেহ। মহারাজ, আমার পক্ষে এ'ই যথেষ্ট। আপনার থেকে চিকিৎসার বিনিময়ে যে কিছু নেবো, তাও কি সম্ভব! আমার দ্বারা সামান্য উপকারও যে পেয়েছেন বলে আপনার ধারণা হয়েছে। এতই আমি নিজকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করছি। এহেন সামান্য উপকার আপনার স্মরণ থাকলে, তা'ই আমার যথেষ্ট লাভ বলে মনে করবো।’

তখন রাজা বিম্বিসার প্রসন্ন-হাস্যে বল্লেন-‘প্রিয় জীবক, নির্লোভ চিন্তের পরিচয় দিয়ে তুমি আমায় অবাক করলে! তুমি মহান হও, তোমার মহদন্তঃকরণ জগতের হিতার্থে নিয়োজিত হোক, এটাই আমার আন্তরিক আশীর্বাদ। তাই আমার একান্ত ইচ্ছা-আজ থেকে তুমি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের চিকিৎসক হও, তথা আমার ও আমার অন্তঃপুর-মহিলাদেরও।’

জীবক সোৎসাহে বললেন-‘দেব, আপনার আদেশ শিরোধার্য। তাতো আমারই প্রধান কর্তব্য।

মহারাজ বিম্বিসার তখন স্রোতাপন্ন আর্যশ্রাবক । সে-চিন্তে তিনি জীবককে চিন্তা ও বিচার করলেন । তাঁর উদারতা ও ধর্মভাব দেখে রাজা অত্যধিক প্রীত ও মুগ্ধ হলেন । তিনি প্রসন্ন-মুখে বললেন-‘জীবক, তোমার কর্তব্য-জ্ঞান ও আর্যদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখে আমি অতিশয় আনন্দিত হয়েছি । তুমি আমার একান্ত স্নেহের-পাত্র, তাই তোমার প্রতিও আমার একটা কর্তব্য আছে । সুতরাং স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ আমি তোমায় কিছু দিতে চাই; তা’ তোমাকে নিতেই হবে’ । এ বলে তিনি জীবককে সুন্দর ও সুবিপুল একখানা প্রাসাদ, এক বিশাল আম্র-উদ্যান, প্রতি বৎসর লক্ষমুদ্রা আয়ের কয়েকখানা গ্রাম, দাস-দাসি, চাকর-চাকরানি, হস্তী, অশ্ব ও অশ্বরথ প্রদান করলেন । মতান্তরে-ব্যাধি-মুক্ত হয়ে বিম্বিসার ভাবলেন-‘জীবক সদাশয় লোক হলে, তাকে উপযুক্ত সম্বর্ধনা করা কর্তব্য । আর যদি ওর কোনো দূরভিসন্ধি থাকে, তবে এরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে রাজধানীতে রাখা নিরাপদ নয় ।’ এ চিন্তা করে তিনি জীবকের অভিপ্রায় পরীক্ষার্থী রাণীদের বললেন-‘জীবক আমার রোগমুক্ত করেছে, অতএব তোমরা সকলে তাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে সন্তুষ্ট করো । রাজ্ঞীরা প্রত্যেকে তাঁকে এক একটি মহামূল্য রাজপরিচ্ছদ উপহার দিলেন । জীবক সে সব প্রত্যাখ্যান করলেন । বললেন-‘আমার মত দরিদ্র রাজ-পরিচ্ছদের যোগ্য নয়, মহারাজের কৃপাভাজন হতে পারলেই আমি পরম লাভ মনে করবো । তাতেই আমি ধন্য হবো । আমার জন্য পুরস্কারের প্রয়োজন নেই । এতেই বিম্বিসার বুঝতে পারলেন-জীবক সদাশয় ব্যক্তি, তাঁর কোনও মন্দ-অভিপ্রায় নেই । তিনি জীবকের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে রাজবৈদ্যপদে তাঁকে নিয়োগ করলেন এবং তাঁর ভরণ-পোষণের জন্য অনেক গ্রাম ও উদ্যান প্রদান করলেন ।।

* * * * *

তখন রাজগৃহবাসী জনৈক শ্রেষ্ঠী সাত বৎসর যাবৎ শিরঃরোগ ভোগ করছিলেন। অহোরাত্র অসহ্য-যন্ত্রণায় তিনি উন্মাদতুল্য হলেন। খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ এ রোগের মূল-কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না। তবুও সন্দেহক্রমে প্রয়োগ করলেন নানা প্রকার ভেষজ। এতে কোনও ফল হলো না। দিন দিন কেবল বৃদ্ধিই পেতে লাগলো এই দুরন্ত রোগ। চিকিৎসকগণ হতাশ হলেন। এ রোগ তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচর। তবুও মন্তব্য করলেন এরূপ-‘এ রোগ অচিকিৎস্য। রোগীর মৃত্যু অনিবার্য।’ কেউ বললেন-‘পঞ্চম দিবসে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।’ আর কেউ বললেন-‘সপ্তম দিবসে নিশ্চয়ই মৃত্যু হবে।’ সুতরাং চিকিৎসকগণ রোগী ত্যাগ করে চলে গেলেন। বৈদ্য-পরিত্যক্ত রোগী এবার সম্পূর্ণরূপে জীবনের আশা ত্যাগ করলেন। শিরঃ বেদনাও তীব্রতর হয়ে মৃতপ্রায় করে তুললো তাঁকে। এ দুঃসহ দুঃখের কবল থেকে ত্রাণ পাবার ইচ্ছায় মৃত্যু-বরণই তাঁর শ্রেয় মনে হলো।

এসময় জনৈক সদাশয় ব্যক্তি চিন্তা করলেন-“এ ধনাঢ্য লোকটি দেশবাসীর মহাউপকারী; তথা বাজারও। বৈদ্যগণ তাঁকে ত্যাগ করেছেন। বড়োই পরিতাপের বিষয় হবে, যদি তাঁর মৃত্যু হয়। রাজবৈদ্য জীবক খুব খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি তরুণ ও ভদ্র। শ্রেষ্ঠীর চিকিৎসার জন্য আমরা গিয়ে রাজার নিকট তাঁকে প্রার্থনা করবো।’ এ চিন্তা করে তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে নরপতি বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হলেন এবং শ্রেষ্ঠীর রোগের কথা ব্যক্ত করে তাঁর চিকিৎসার্থ জীবককে পাঠাতে তাঁকে অনুরোধ করলেন। রাজাও দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং তখনই তা’ জীবককে আদেশ করলেন। জীবক রাজাদেশ প্রতিপালন করলেন। যথাসত্ত্বর এসে রোগীকে দেখলেন। দেখামাত্র রোগের কারণ নির্ণয় করে বললেন-শ্রেষ্ঠীপ্রবর, আপনার রোগ খুব জটিল। আরোগ্য হতে দীর্ঘ-দিনের প্রয়োজন। এক বৎসর নয় মাস কেবল থাকতে হবে শয্যাগত হয়ে। ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন কি?

রোগী ক্ষীণ-কঠে বললেন-‘আর কি করি বৈদ্যরাজ, সাত বৎসর ব্যাপী তো এতো দুঃখ ভোগ করলাম; না হয় আরো কিছুদিন করলাম আর কি।’

‘তা’ হলে আপনাকে ডান-পাশে সাত মাস, বাঁ-পাশে সাত মাস এবং চিৎ হয়ে সাত মাস শুয়ে থাকতে হবে; কেমন পারবেন তো?’
‘হ্যাঁ, কি করি, পারতেই হবে।’

‘পারলে ভালো। যদি না পারেন, এর ব্যতিক্রম করেন যদি, মনে রাখবেন- আরোগ্য লাভ করতে পারবেন না’।

‘বেশ ভালো। আচ্ছা শ্রেষ্ঠী মশায়, আপনি রোগমুক্ত হলে, আমায় কি দেবেন?’
তখন শ্রেষ্ঠী সোৎসাহে বললেন-‘আপনাকে কি দেবো বলছেন?

আপনাকে দেবো- আমার সর্বস্ব, আমিও দাস হবো আপনার।

‘ঠিক বলছেন তো শ্রেষ্ঠী মশায়?’

‘হ্যাঁ ভিষক মহাশয়, ঠিকই বলছি।’

‘এ কথা আপনার মনে থাকে যেন।’

‘হ্যাঁ, নিশ্চয় মনে থাকবে।’

‘অতি উত্তম, তা’ হলে আপনার চিকিৎসা এখন আরম্ভ করতে পারি।’

জীবক শ্রেষ্ঠীকে মঞ্চের উপর যথাবিধি শয়ন করিয়ে মঞ্চের সহিত তাঁকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করলেন। তারপর তীক্ষ্ণ-অস্ত্রে তাঁর মস্তক চর্ম বিদীর্ণ করে, সন্ধিস্থল ছিন্ন করে অভ্যন্তর হতে দু’টি পোকা বের করলেন।

তা’ সকলকে দেখালেন। দেখে, সকলেই বিস্ময়ে বিমূঢ় হলো। জীবক বললেন- ‘আপনারা দেখুন, এ দু’টি পোকাকার মধ্যে একটি বড়, অপরটি ছোট। চিকিৎসকদের মধ্যে যাঁরা বলেছেন-পঞ্চম দিবসে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য; তা’ মিথ্যা নয়। এ বড় পোকাটি পঞ্চম দিবসে এঁর মস্তিষ্ক খেয়ে নিঃশেষ করলে, সে’ সঙ্গেই রোগীর মৃত্যু হতো। আর যাঁরা বলেছেন- সপ্তম দিবসে মৃত্যু হবে, তাও সত্য। এ ছোট পোকাটি সাত দিনে রোগীর সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক খেয়ে শেষ করতো এবং সে’ সঙ্গেই রোগীর মৃত্যু হতো। চিকিৎসকদের অনুমান ঠিকই।’

অতঃপর জীবক শ্রেষ্ঠীর মস্তকের সন্ধিস্থল যথাযোগ্যমতে সংযোজিত

করে, চর্ম সেলাই করে ওষুধ প্রলেপ দেওয়ার পর উত্তমরূপে বন্ধন করে দিলেন। শ্রেষ্ঠী এক অবস্থাতেই সাতদিন অতিবাহিত করে জীবককে বললেন-‘বৈদ্য মশায়, এ পাশে আর শুয়ে থাকতে পারছি না।’

জীবক বললেন- ‘শ্রেষ্ঠীবর, আপনি না প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এক পাশে সাত মাস শুয়ে থাকবেন?’

‘হ্যাঁ, বলেছিলাম বটে, কিন্তু আমার অসহ্য হচ্ছে; এভাবে একপাশে সাত মাস পড়ে থাকতে হলে, মরণ আর কি।’

‘আচ্ছা, তা’হলে অন্যপাশে শয়ন করুন। কিন্তু, বলে দিছি, এ পাশে আপনাকে নিশ্চয়ই সাত মাস থাকতে হবে।’

শ্রেষ্ঠী অন্য পার্শ্বে শয়ন করলেন। সাতদিন অতীত হলে, জীবককে বললেন- ‘বৈদ্য মশায়, আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে, এপাশে আর পাচ্ছি না।’

‘কেন, আপনি যে বলেছিলেন? এতো অধৈর্য হলে কি করে চলবে?’

‘হ্যাঁ, বলেছিলাম বটে, কিন্তু ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে?’ ‘আচ্ছা বুঝেছি, তা’হলে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকুন।’

রোগী উত্তাল অবস্থায় সপ্তাহ অতিক্রমের পর জীবককে বললেন- ‘এভাবে আর পাচ্ছি না।’

‘কেন, আপনি যে বলেছিলেন?’

‘হ্যাঁ বললেও কিন্তু অসহ্য হয়েছে। এরূপে থাকলে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মরে যাবো।’

জীবক তখন হেসে উঠলেন। বললেন-‘দেখুন শ্রেষ্ঠী প্রবর, দীর্ঘদিনের কথা না বললে, এ অল্প কয়দিনও পারতেন না। আমি তখনি বুঝেছিলাম, তিন সপ্তাহে আপনি আরোগ্য লাভ করবেন। উঠুন মহাশ্রেষ্ঠী, আপনি রোগ মুক্ত হয়েছেন। এবার আমায় পুরস্কার দিয়ে বিদায় করুন দেখি।’

শ্রেষ্ঠী প্রফুল্ল-হাস্যে বললেন-‘আপনি আমার জীবন-দাতা। সুতরাং আমার সমস্ত সম্পত্তিই আপনারা হোক এবং আমিও আপনার দাস হলাম।’

জীবক মৃদু-হাস্যে বললেন-‘শ্রেষ্ঠীপ্রবর, আমাকে সবদিয়ে আপনি ভিখারী হবেন না কি?’

‘আমি তো আপনার দাসই হয়েছি।’

জীবক হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন-‘ধন্যবাদ শ্রেষ্ঠীপ্রবর, আপনার সদাশয়তায় আমি অতীব সন্তুষ্ট হয়েছি। মনে করবেন না- আমি এতো নির্ভুর। আমার প্রবৃত্তিও নয় এতো হীন। আর আপনার সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করবার মতো লোভ-চিন্তেরও আমি অধীন নই। অপিচ, এতো সম্পদও আমার প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ এ পর্যন্ত দিতে পারেন-মহারাজকে এক লক্ষ, আর আমাকে এক লক্ষ মুদ্রা’। শ্রেষ্ঠী ‘তথাস্তু’ বলে প্রদান করলেন নৃপতি বিম্বিসারকে এক লক্ষ এবং জীবককে এক লক্ষ মুদ্রা।

* * * * *

তখন বারাণসীর জনৈক শ্রেষ্ঠীপুত্র উর্ধ্বপাদ-অধোশিরঃ হয়ে ক্রীড়া করার সময় উদরের অন্ত্র গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে গেলো। খাদ্য-ভোজ্য আর সম্যকরূপে জীর্ণ হয় না, বাহ্য-প্রস্রাবেরও ঘটলো ব্যতিক্রম। ক্রমশ কৃশ ও বিবর্ণ হতে লাগলো ওর শরীর, সর্বাস্থে ভেসে উঠলো শিরা-উপশিরা। মাতা-পিতা হলেন চিন্তাগ্রস্ত। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের চিকিৎসা চললো, কিন্তু কোনও প্রতিকার হলো না। পরিশেষে জীবকের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। জীবক রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। রোগের মূল-কারণ নির্ণয় করতে অধিক সময় লাগলো না। তখন তিনি সেখান থেকে সকলকে সরিয়ে দিয়ে স্থানটা যবনিকাবৃত করলেন। রোগীকে এক স্তম্ভের সহিত দৃঢ়রূপে বন্ধন করলেন। ওর স্ত্রীকে সম্মুখে রেখে উদরে অস্ত্রোপচার করলেন। অস্ত্র-গ্রন্থি বের করে মহিলাটিকে দেখালেন, বললেন-‘দেখো, তোমার স্বামীর রোগ; এইটিই সকল রোগের মূল-কারণ।’ অতঃপর জীবক গ্রন্থি ছাড়িয়ে পুনরায় যথাস্থানে অন্ত্র প্রবেশ করিয়ে দিলেন। উদর-চর্ম সেলাই করে ওষুধ প্রলেপ দিলেন। এতে রোগী অচিরেই আরোগ্য লাভ করলো। এ কাজের পুরস্কার স্বরূপ জীবককে প্রদত্ত হলো ষোড়শ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

৷ আট ৷

ভিষকশ্রেষ্ঠ জীবকের কীর্তি-কলাপ অচিরেই সহস্রমুখী হয়ে ছড়িয়ে পড়লো দেশ-দেশান্তরে। প্রথমাবস্থায় কয়েকটা জটিল-ব্যাধি আরোগ্য করায় এ তরুণ-বৈদ্য সকলেরই সুনজরে পড়লেন। অভিজ্ঞ ও সুচিকিৎসক হিসেবে তিনি সহসা আকর্ষণ করলেন সকলের শ্রদ্ধা। সর্বসাধারণের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মালো, তাঁর ওষুধ প্রয়োগ বজ্রের মতো অব্যর্থ ও রোগ নির্ণয়ে তিনি বিচক্ষণ।

দেশ-বিদেশের বহু রোগীর জন্য জীবকের আহ্বান আসতে লাগলো। দিব্যদৃষ্টির মতো অসাধারণ ক্ষমতা জন্মেছিলো জীবকের। যে কোনও জটিল-ব্যাধি হোক না কেন, রোগী দেখামাত্রই নির্ণয় করতে পারতেন রোগের মূল কারণ। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যে জীবকের প্রসার এত বেড়ে গেলো যে, সামান্য বিশ্রামের সুযোগও মিলতো না তাঁর।

জীবক স্বভাবতঃ ধার্মিক, ভদ্র, অমায়িক ও প্রিয়ভাষী ছিলেন। তাঁর মধুর আলাপ সকলকে আনন্দ দান করতো। অচিরেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁর প্রত্যেক বাক্যই অর্থসঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ। যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ জটিল-বিষয়ের তিনি ছিলেন ন্যায় ও যুক্তি-সঙ্গত পরামর্শ দানে পটু। তাই মহারাজ বিম্বিসার তাঁকে মন্ত্রিপদে বরণ করে নিয়েছিলেন।

জীবক চিকিৎসা ব্যবসায়ে অজস্র অর্থোপার্জন করেছিলেন। তাঁর প্রভূত ধনাগম হয়েছিলো রাজা, মহারাজ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের চিকিৎসা করে। তিনি মহাবিভবশালী হয়েও কোনোদিন বিলাস-ব্যসনে *[বিলাস- ক্রীড়া, কৌতুক, আমোদ, আরাম উপভোগ ও সৌখিনতা ইত্যাদি]*।

ব্যসন- সুরাপান, বেশ্যাসক্তি, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, মৃগয়া, বৃথাভ্রমণ, দ্যুত (পাশা, দাবা ও জুয়াখেলা), নৃত্য-গীত ও ক্রীড়া এই দশবিধ কামজ দোষ এবং দৌরাভ্যা, দুষ্টত্ব, ক্ষতি, প্রতারণা, ঈর্ষা, ঘেঁষ, কটুক্তি ও নিষ্ঠুরাচরণ এ অষ্টবিধ ক্রোধজ দোষ। অপব্যয় করেননি এক কপর্দকও। ধর্মপথেই ব্যয়িত হতো তাঁর অর্থ; তা'তেই তিনি উপভোগ করতেন অপার আনন্দ।

জীবক ছিলেন বুদ্ধের পরম ভক্ত। ভিক্ষুসংঘের প্রতিও ছিলো তাঁর

অগাধ শ্রদ্ধা। দৈনিক অন্তত তিনবার বুদ্ধ-দর্শন করা চাই; না হয়, তিনি অস্বস্তিবোধ করতেন। ভগবান যেন তাঁর সন্নিহিতই অবস্থান করেন, এটাই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। তাই তিনি রাজ-দত্ত আম্রোদ্যানে বহু অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন সুগতের বাসোপযোগী বিবেকপূর্ণ সুন্দর একখানা সুবৃহৎ বিহার! এ মহাবিহারখানা মনোরম শৃঙ্খলায় হয়েছিলো সুসজ্জিত। যথা-আম্রকাননের মধ্যভাগে নির্মিত হয়েছিলো সুদৃশ্য বিশাল ধর্মমণ্ডপ। এর চারপাশে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের প্রান্ত ভাগ পরিবেষ্টন করে চারধারে অপূর্ব সাজে সজ্জিত প্রাসাদ-শ্রেণী। এর বহির্ভাগে পুষ্পোদ্যান, তারপর প্রাকার-বেষ্টনী।

উক্ত বিহার ‘আম্রকানন বিহার’ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করলো।

পঞ্চ শতাব্দিক ভিক্ষু সকল সময় অবস্থান করতেন এ বিহারে। তথাগতও অবস্থান করতেন কোন কোন সময়ে। অতি নির্জন ও বিবেক-প্রগতির অনুকূল স্থান বিধায় ভিক্ষুসংঘের অতীব প্রীতিপ্রদ হয়েছিলো এ বিহার। এ সুযোগে জীবক দানে-ধর্মে হলেন ব্যাপ্ত। বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের পরিচর্যায় নিজকে নিয়োজিত রাখলেন তাঁর অবশিষ্ট জীবন।

১ নয় ১

একদা শাক্যমুনি সম্মুখ জীবক-নির্মিত আম্রকানন বিহারে অবস্থান করছিলেন। একদিবস জীবক বিহারে উপনীত হয়ে সুগতকে বন্দনান্তে বিনীত বাক্যে জিজ্ঞাসা করলেন-‘প্রভু ভগবন্, আমি লোক মুখে গুনলাম-‘জনগণ শ্রমণ গৌতমের উদ্দেশ্যে প্রাণীহত্যা করে, শ্রমণ গৌতম তা’ জেনেও পরিভোগ করেন-তঁার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত মৎস্য-মাংস। এটা নিশ্চয়ই তঁার প্রত্যক্ষ অকুশল কর্ম।’ ভগবান লোকেরা যে এরূপ বলছে, তা’কি সত্য? না কি আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার মাত্র?’

তথাগত বললেন-‘জীবক, তা’ কখনও সত্য নয়। তা’ আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার মাত্র। আমি বলছি-তিনটা কারণে পরিভোগের অযোগ্য হয় মৎস্য-মাংস; যথা-দৃষ্ট, শ্রুত ও সন্দেহ।

দৃষ্ট-প্রাণীহত্যা করার সময় ভিক্ষুর দৃষ্টিগোচর হলে, সেই মৎস্য মাংস পরিভোগ করতে পারে না সে ভিক্ষু। শ্রুত-ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে প্রাণীহত্যা করা হলে, এ কথা যদি ভিক্ষুর শ্রুতিগোচর হয়, সে ভিক্ষু পরিভোগ করতে পারে না-উদ্দেশ্যকৃত সেই মৎস্য মাংস।

সন্দেহ- আহারের সময় এরূপ যদি হয় সন্দেহোৎপন্ন- ‘বোধ হয়, আমার উদ্দেশ্যেই হত্যা করে প্রস্তুত করা হয়েছে এ মৎস্য-মাংস, তা’হলে সে ভিক্ষুর পক্ষে পরিভোগের অযোগ্য হয় সেই মৎস্য-মাংস; ধর্মতঃ দোষী হয় যদি পরিভোগ করে।

জীবক, আবার তিনটা কারণে পরিভোগের যোগ্য হয় মৎস্য-মাংস; যথা অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অসন্দিগ্ধ।

প্রাণীহত্যা করার সময় ভিক্ষু যদি না দেখে, না শোনে অথবা আহারের সময়ও কোনো প্রকার হয় না সন্দেহ উৎপন্ন সেরূপ মৎস্য মাংসই ভিক্ষুর পক্ষে আহারের উপযোগী।

আহারের সময় ভিক্ষুর সন্দেহ উৎপন্ন হলে, তখন যদি দায়ক এরূপ আর্থ-নীতি সম্মত উপযুক্ত বাক্য বলে-‘ভগ্নে, ইহা আপনার উদ্দেশ্যে হত্যা করা হয় নি, আপনি নিঃসন্দেহে আহার করুন। এরূপ ধর্মানুকূল বাক্য বললে আহারের উপযোগী হয় সে মৎস্য মাংস।

জীবক, মনে করো- কোনে একজন ভিক্ষু অখিল-জগতের সকল প্রাণীর প্রতি বৈরিতা-শূন্য অপ্রমাণ-মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা সহগত চিন্তে অবস্থান করছে। এমন সময় কোনও একজন গৃহপতি এসে উক্ত ভিক্ষুকে পরবর্তী দিবসের জন্য নিমন্ত্রণ করে গেলো। পরদিন সে ভিক্ষু নিমন্ত্রণকারীর গৃহে উপস্থিত হলে, গৃহস্বামী তা'কে পরিবেক্ষণ করলো অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য। তখন সে ভিক্ষু সেই আহাৰ্য বস্তুর প্রতি উৎপাদন না করে যদি তৃষ্ণা এবং চিন্তাও না করে যদি এরূপ- 'গৃহস্বামী যেন ভবিষ্যতেও আমায় দান করে এরূপ উত্তম খাদ্য-ভোজ্য।' অপিচ, সে ভিক্ষু যদি চিন্তা করে- 'আহা, আহাৰ্য বস্তুর অন্বেষণ কতো দুঃখ-দায়ক; সংসার জন্মগ্রহণ করলে-বারবার ভোগ করতে হবে এরূপ অসহ্য-দুঃখ। অনাহার-ক্লিষ্ট জীবনও কতো যন্ত্রণাপূর্ণ।' তৃষ্ণার নিরবশেষ নিরোধেই নিবৃত্তি হয় জঠরের জ্বালা।' এরূপ চিন্তায় মনসংযোগ করে খাদ্য-ভোজ্যের প্রতি দোষদর্শী হয়ে লোভহীন চিন্তে যদি আহাৰ্য করে, তবে কি তখন সে ভিক্ষুর দ্বারা নিজের অথবা পরের কোনও অনিষ্টকর চিন্তা করা হলো?'

জীবক অতি প্রসন্ন হয়ে বললেন- 'না প্রভো, একান্তই নয়।'।

'তা' হলে জীবক, সে ভিক্ষু নির্দোষ আহাৰ্যই আহাৰ্য করছে নয় কি? 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই প্রভো। শুনছি-ব্রহ্মগণ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা-বিহারী। কিন্তু, এস্থলে তার সাক্ষীরূপে স্বচক্ষে দেখছি আপনাকেই। ভগবান, আপনি মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার মূর্ত-প্রতীক।' বললেন জীবক আনন্দ-মুখর কণ্ঠে।

'জীবক, কামরাগ, বিদ্বেষ ও মোহগ্রস্ত মানবগণ বিপর্যয়প্রাপ্ত ও দুঃখমগ্ন হয়। কিন্তু, তথাগতের সমূলে ক্ষয় ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে সেই দোষত্রয়, রহিত ও নিরুদ্ধ হয়েছে ভবিষ্যতে উৎপত্তির কারণ।

জীবক, তথাগত অথবা তথাগতের শিষ্যের উদ্দেশ্যে প্রাণীহত্যা করে যে ব্যক্তি, যে বহু অপুণ্য সঞ্চয় করে পাঁচটা কারণে। যথা-

১। হত্যার উদ্দেশ্যে বলে- 'হে যাও, অমুক প্রাণীটা নিয়ে এসো' এ প্রথম কারণে সে বহু অপুণ্য সঞ্চয় করে।

- ২। গ্রাবী-বন্ধন করে নিয়ে আসার সময় প্রাণীটা দুঃখ ও মনোবেদনা প্রাপ্ত হয়, এ দ্বিতীয় কারণে সে বহু অপুণ্য সঞ্চয় করে।
- ৩। যেহেতু সে এরূপ বলে-‘যাও ওহে এ প্রাণীটাকে হত্যা করো,’ তৃতীয় কারণে সে বহু অপুণ্য সঞ্চয় করে।
- ৪। হত্যার সময় প্রাণীটা যে দুঃখ-মনোবেদনা ভোগ করে, এ’ চতুর্থ কারণে সে বহু অপুণ্য সঞ্চয় করে।
- ৫। তথাগত অথবা তাঁর শিষ্যকে সে যে, আহার করালো আর্যনীতি-বিরুদ্ধ অনুপযোগী মৎস্য-মাংস, এ পঞ্চম কারণে সঞ্চয় করে সে বহু অপুণ্য।’

সম্মুদ্রের সুযুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ অশ্রুতপূর্ব-বাণী শ্রবণে জীবক বিস্ময়োৎফুল্ল হয়ে বললেন-‘আশ্চর্য প্রভো! ভিক্ষুগণ উপযুক্ত আহার্যই আহার করেন, দোষহীন ভোজ্যবস্তুই ভোজন করেন। অতি উত্তম, অতি উত্তম! লোকে যেমন অধোমুখ-পাত্র উর্ধ্বমুখী করে, প্রচ্ছন্ন বস্তু করে বিবৃত, পথভ্রান্ত কে দেখিয়ে দেয় সত্য-সহজ পথ, চক্ষুস্মানের রূপ দর্শনার্থ অন্ধকারে ধারণ করে যেমন আলোক-মালা, আপনিও তেমন বিবিধ উপমা-যুক্তি সহকারে প্রকাশ করলেন আলোকোজ্জ্বল সত্যধর্ম। আমি ভগবান বুদ্ধের শরণাপন্ন হচ্ছি, তথা ধর্ম ও সংঘেরও। আজ থেকে আমার জীবনের অন্তিম নিশ্বাস পর্যন্ত রত্নত্রয়ের* /বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ/ শরণাগত উপাসকরূপে আমায় গ্রহণ করুন।’

৷ দশ ৷

এক সময় পঞ্চবিধ জটিল-রোগ প্রাদুর্ভূত হয়েছিলো মগধরাজ্যে। যথা-কুষ্ঠ, শ্বেতকুষ্ঠ, গণ্ড, যক্ষ্মা ও উন্মত্ততা। এসব রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জীবকের নিকট এসে অনুরোধ করলো-‘বৈদ্য মহাশয়, আমাদের ব্যধিমুক্ত করুন।’ তখন জীবক অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন চিকিৎসাকার্যে। তাই বললেন- ‘আমার অনেক কাজ, মোটেই অবসর নেই। মহারাজ বিম্বিসার, রাজান্তঃপুরবাসী, বুদ্ধ ও ভিক্ষুদের চিকিৎসাকাজে এখন আমি খুব ব্যস্ত। এসব সম্পাদন করতে সময়ের সঙ্কুলান হয় না, আপনাদের চিকিৎসা কখন করি বলুন; তা’ সম্ভব হবে না।’

পুনরায় তারা এ বলে কাতর অনুরোধ করলো-‘বৈদ্য মহাশয়, আমাদের সমস্ত সম্পদ আপনাকে দিচ্ছি, আমরাও চিরকাল দাস হয়ে থাকবো আপনার সানুনয় প্রার্থনা করছি- আমাদের রোগ মুক্ত করুন।’

‘বলছি তো সময় নেই, আমি পারবো না।’

তখন রোগীরা হতাশ হয়ে চিন্তা করলো-ভিক্ষুরা দেখছি সব দিক দিয়েই সুখী। ভোজন-শয়ন সুখেই চলছে; রাজবৈদ্যের চিকিৎসাও চলছে অনায়াসে। আমরাও ভিক্ষু হলে, জীবক তখন চিকিৎসা করবেন আমাদের।’

অচিরে ভিক্ষুত্বে দীক্ষা নিলো ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ। ভিক্ষুদের পরিচর্যা ও জীবকের চিকিৎসায় সহসা রোগমুক্ত হলো তারা। তা’ শুনে দলে দলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ভিক্ষুত্ব বরণ করে নিলো এবং সত্ত্বর রোগমুক্ত হলো। রুগ্ন ভিক্ষুদের চিকিৎসায় জীবক এতদূর ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, রাজপুরীর চিকিৎসা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

রোগারোগ্য-মানসে যারা গ্রহণ করিছিলো ভিক্ষুধর্ম, আরোগ্য লাভ করে, তা’দের অনেকেই ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলো। তা’দের অবস্থান্তর দেখে জীবক জিজ্ঞাসা করলেন- ‘আপনারা ধর্মজীবন ত্যাগ করলেন কেন?’

তারা উত্তর করলো-‘আমরা রোগমুক্ত হয়েছি, আর আমাদের ধর্মের প্রয়োজন নেই।’

জীবক একথা শুনো বড়ো দুঃখিত হলেন । তিনি ভগবানকে একথা জানিয়ে অনুরোধ করলেন-‘ভগবন্, এরূপ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে সুগত-শাসনে প্রবেশের অধিকার না দিলেই ভালো হয় ।’

জীবক চলে যাওয়ার পর তথাগত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে এরূপ আদেশ ঘোষণা করলেন- ‘ভিক্ষুগণ, কুষ্ঠ, শ্বেতকুষ্ঠ, গণ্ড, যক্ষ্মা ও উন্মত্ততা এ পঞ্চবিধ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা প্রদান করবে না । যে করবে, তার হবে ‘দুষ্কৃত’ অপরাধ ।’

॥ এগার ॥

তখন উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের পাণ্ডুরোগ হয়েছিলো। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি আরোগ্য লাভ করলেন না। অতঃপর রাজা প্রদ্যোৎ মগধরাজকে দূতমুখে রোগের বিবরণ জানিয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন জীবককে প্রেরণের জন্য। নৃপতি বিন্বিসার জীবককে আদেশ করলেন উজ্জয়িনীতে গিয়ে প্রদ্যোৎরাজের চিকিৎসা করার জন্য। রাজাদেশে জীবক গিয়ে প্রদ্যোৎ রাজের সহিত সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর রোগ-লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বললেন- ‘রাজন, আপনার রোগের জন্য ঘৃত পাক করতে হবে। ঘৃতের নাম শুনা মাত্রই নরপতি বৃশ্চিক দংশনবৎ মুখ বিকৃত করে বলে উঠলেন-‘না না, তা’হবে না। ঘৃত বাদ দিয়ে, আর যে কোনো উপায়ে পারা যায়, আরোগ্য করে দাও। ঘৃতের নাম শুনেও আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠে। এতো ঘৃণাবোধ হয় যে, আমার বমি আসে তা’ দেখলেও। কিছুতেই পারবো না তা’ সেবন করতে।’* [রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের মাতা পুষ্পবতী হওয়ার পর শায়িতাবস্থায় একটি বৃশ্চিক তদীয় নাভীমূলের চারধারে সঞ্চরণ করেছিলো। এ বৃশ্চিক-স্পর্শ তিনি কামচিঙ্ডে উপভোগ করেছিলেন। তারপর হলো তাঁর গর্ভ-সঞ্চরণ। জন্ম নিলেন চণ্ডপ্রদ্যোৎ। রাশিও তাঁর বৃশ্চিক। ঘৃত বৃশ্চিক-বিষ প্রতিষেধক। সুতরাং ঘৃত বৃশ্চিকের প্রতিকূল বিধায় প্রদ্যোৎরাজেরও অসহ্য হতো ঘৃত। এমন কি এর গন্ধও সহ্য হতো না তাঁর। (সমস্তপাসাদিকা)]

জীবক চিন্তান্বিত হলেন রাজার কথা শুনে। এ রোগ উপশমের আর অন্য কোনও উপায় নেই, একমাত্র ঘৃত ব্যতীত। তিনি চিন্তা করে স্থির করলেন-‘এমন উপাদানে ঘৃত পাক করা হবে, তা’ যেন হয় কষায়-বর্ণ, কষায়-গন্ধ ও কষায়-রস। তা সেবন কালেও যেন অনুভব না হয়, এতে ঘৃত মিশানো আছে।’ মনোভাব গোপন রেখে তিনি নৃপতিকে বললেন- ‘মহারাজ, আপনার অভিরুচি অনুসারেই কার্য হোক।

জীবক যথাচিন্তিত মতে ঘৃত পাক করলেন। এর বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদও হলো কষায়। তখন তিনি আবার চিন্তা করলেন-‘এই কষায় জীর্ণ হবার

সময় ঘৃত-গন্ধযুক্ত বায়ু উদ্গার হবে। তখন রাজা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন-ইহা ঘৃত-মিশ্রিত। আমি জানি-রাজা অতি প্রচণ্ড-স্বভাবের। তাই তাঁর নামও হয়েছে-চণ্ডপ্রদ্যোৎ। এতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমায় হত্যাও করতে পারেন। এ সময় আমার সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। পালাবার উপায় করতে হবে।’ এভাবে তিনি নৃপতিকে বল্লেন- ‘মহারাজ’ আপনার ওষুধ প্রস্তুত করার সময় আমাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে।’ এমন ভাবে ভৈষজ্য সংগ্রহ করতে হবে, তা’তৎমুহূর্তে না হলে, হবে না। পূর্বেও আবার সংগ্রহ করে রাখা যায় না, তাও আনতে হবে দূরস্থান থেকে। অনেক সময় আমাকে দ্রুত আসা-যাওয়া করতে হবে। আপনার কর্মচারীদের আদেশ করেন-‘আমি হস্তী বা অশ্ব যে কোন বাহনে অরোহণ করে, যে কোনো মুহূর্তে, যে-কোনো দ্বারে যেন আসা-যাওয়া করতে পারি’। রাজা জীবকের কথা মতোই আদেশ প্রচার করলেন।

* * * * *

মহারাজ প্রদ্যোৎ পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যকর্মের প্রভাবে ইহজন্মে পাঁচটি বাহন লাভ করেছিলেন। তাঁর (১) ভদ্রবতী নামিকা হস্তিনী একদিনে ৫০ যোজন (৪০০ মাইল), (২) কাক নামক দাস ৬০ যোজন (৪৮০ মাইল), (৩) নালাগিরি নামক হস্তী একশত যোজন (৮০০ মাইল), (৪) চেলকর্ণ ও (৫) মুঞ্জকেশ নামক দু’টি অশ্ব বিশ শত যোজন (১৬০০০ মাইল) গমনে সমর্থ।

পূর্বজন্ম- প্রদ্যোৎরাজ পূর্বজন্মে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির কর্মচারী হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদিন গৃহস্বামী আহারে বসেছেন মাত্র, এমন সময়ে এই কর্মচারী এসে সংবাদ দিলেন-‘প্রভো, এক পক্ষেক বুদ্ধ পিণ্ডাচরণে এসে কিছু না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন।’ তা’তৎমুহূর্তে গৃহস্বামী বললেন- ‘যাও হে, যথাসত্ত্ব তাঁর পাত্রটি নিয়ে এসো।’

কর্মচারী অতি দ্রুতবেগে গিয়ে পাত্রটি নিয়ে এলেন। গৃহস্বামী নিজের জন্য সজ্জিত আহার্য-দ্রব্য পাত্রটি পূর্ণ করে দিলেন এবং বললেন- ‘যাও ওহে, যত শীঘ্র পার পাত্রটি দিয়ে এসো।’

কর্মচারী অতি দ্রুতবেগে গিয়ে পাত্রটি ‘পচ্ছেক’ বুদ্ধের হস্তে প্রদান করলেন। তারপর বন্দনা করে এরূপ প্রার্থনা করলেন-‘প্রভো আশীর্বাদ করুন- আমার দ্রুত আসা-যাওয়ায় যা’ কায়িক পরিচর্যা হলো, এতে পুণ্যসঞ্চয় হলো যা’ তৎপ্রভাবে আমি যেন ভবিষ্যৎ জন্মে লাভ করতে পারি-অতি বেগবান বাহন।

আশীর্বাদ করলেন পচ্ছেক বুদ্ধ-

‘তোমার ইচ্ছিত-প্রার্থিত বিষয় ভাস্বর পূর্ণ-

চন্দ্রসম যথাসত্বর সাফল্য-মণ্ডিত হোক,

পূর্ব হোক জ্যোতিরস-মণি নিভ চিত্ত সঙ্কল্প।’

যাঁর ভাগ্যাকাশে সুখ-সূর্য আবির্ভাবের সূচনা হয়, তিনিই সাক্ষাৎ পান মুক্তপুরুষ পচ্ছেক বুদ্ধের। এমন পুণ্য-পূত শুদ্ধাত্মার দর্শনেও পুণ্য পরিচর্যারও পূর্ণ, আশীর্বাদও হয় অব্যর্থ। এরূপ পুণ্যক্ষেত্রে বপন করা হয় যে, বীজ, তা’ই হয় অসীম, অফুরন্ত, অচিন্তনীয়; তাই’ই হয় পরা-শান্তি নিদান। কর্মচারীর এই কুশলকর্মই রাজা প্রদ্যোতের ভাগ্য-নিয়ন্তা। এ পুণ্য-ঋদ্ধির প্রভাবেই আজ তিনি উজ্জয়িনীর মহাপ্রতাপশালী নরপতি হয়ে লাভ করেছেন-অনুভাব সম্পন্ন পঞ্চ বাহন-সম্পদ। এ মহাসম্পদই তাঁর গৌরব-কেতন, এই তাঁর পুণ্যের সাক্ষী।

* * * * *

রাজবৈদ্য জীবক যথাসময়ে ভেষজ হস্তে নৃপতি চণ্ডপ্রদ্যোতের সন্নিধানে উপনীত হয়ে বললেন- ‘মহারাজ, কষায় পান করুন।’ অতঃপর নরেন্দ্রকে ওষুধ সেবন করিয়ে যথাসত্বর তিনি হস্তিশালায় উপস্থিত হলেন এবং হস্তিনী ভদ্রবতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করে দ্রুত নগর হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। রাজার উদরে ওষুধ পরিপাক হবার সময় উদ্গার হলো ঘৃত-গন্ধযুক্ত বায়ু। নৃপতি ঘৃত-গন্ধ পেয়ে জীবকের উপর হলেন ভীষণ ক্রুদ্ধ। তখনি আদেশ করলেন তিনি কর্মচারীদের-‘ওহে, দেখতো তোমরা দুষ্ট জীবককে; কি আশ্চর্য, সে আমায় ঘৃতপান করিয়েছে! এখনি তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো’।

কর্মচারীরা বললো- ‘মহারাজ, জীবক বহুপূর্বে ভদ্রবতীতে আরোহণ করে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেছেন নগর থেকে।’

তদ্রূপে নরেন্দ্র ক্রোধাক্ত হয়ে বললেন-‘এতোদূর স্পর্ধা তার, আশ্চর্য বটে! কাকদাস কোথায়? সত্বর তাকে ডেকে দাও।’

দ্রুতবেগে এলো কাকদাস। নরনাথ তাকে আদেশ করলেন ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে-‘যাও, যাও কাকদাস, জীবককে শিগগির নিয়ে এসো; সে ভদ্রবতী নিয়ে পালিয়ে গেছে; সে দণ্ডার্থ; দেরি করো না, তড়িৎবেগে চলে যাও। তোমায় এটাও সাবধান করে দিচ্ছি-সে বড়ো বুদ্ধিমান, বড়ো মায়াবী, ওর দেওয়া কিছুই খেয়ো না কিন্তু।’

প্রভুর আদেশ পেয়েই কাকদাস ছুটলো তীরবেগে। জীবক রাজগৃহের অর্ধপথে কৌশম্বিতে পৌঁছে আহারে বসেছেন, এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো কাকদাস। বললো সে-‘বৈদ্য মশায়, আপনাকে রাজা ডেকেছেন।’

‘একটু অপেক্ষা করো কাকদাস, আমার খাওয়াটা হয়ে যাক; তুমি তো বড় শ্রান্ত হয়েছেো দেখছি, কিন্তু খেয়ে নাওনা।’

‘না, না কবিরাজ মশায়, আমি কিছুই খাবো না।’

জীবক আহারান্তে নখাঞ্জে যৎ সামান্য ওষুধ রেখে একটি আমলকী খেতে লাগলেন। তা’ অর্ধেক খেয়ে জলপান করতে করতে তিনি বললেন-‘কাকদাস, তুমি তো কিছুই খেলে না, এ অর্ধেক আমলকী আছে, খেয়ে একটু জলপান করোনা; কেমন, খাবে তো?’

কাকদাস চিন্তা করলো-‘এতে কোনো দোষ হবে না মনে হয়। বৈদ্য তো অর্ধেক খেয়েছে, বাকিটুকু আমি খেলে, কীই বা দোষ হতে পারে।’ এভাবে ‘তাই দিন’ বলে হাত বাড়িয়ে দিলো সে। জীবক ওর অলক্ষ্যে আমলকীতে নখ থেকে ওষুধ মিশিয়ে তা’কে দিলেন। ওষুধ এত সামান্য যে, বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেও তা’ ওর নয়নগোচর হলো না। নিঃসন্দেহে সে তা’ খেয়ে জলপান করলো। এর পরক্ষণেই উদরে অনুভব করলো তীব্র-বেদনা এবং সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হলো প্রবল-বাহ্য। বাহ্য হতে লাগলো পুনঃ পুনঃ; এতে সে অত্যধিক দুর্বল ও ভীত

হয়ে পড়লো। তখন সে জীবকের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলো কাতরস্বরে-‘বৈদ্য মশায়, আমি বাঁচবো তো?’

জীবক বললেন স্মিতহাস্যে-‘ভয় নেই কাকদাস, সহসা আরোগ্য লাভ করবে। তোমার উদর বড়ো দোষাশ্রিত হয়েছে, নোংরা হয়েছে; দোষ ক্ষালন হচ্ছে-মন্দ কি? তোমাদের রাজাও হবেন রোগমুক্ত। তিনি বড়ো প্রচণ্ড-স্বভাবের, আমায় হত্যা করার কুমতির সঞ্চার হয়েছে মনে হয়। তাই আমি তোমার সঙ্গে যাবো না। একটু সুস্থ হলে, হাতিটা নিয়ে চলে যেও।’ এ বলে জীবক রাজ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হলেন। যথাসময় তিনি স্বদেশে উপনীত হয়ে নৃপতি বিম্বিসার সমীপে প্রকাশ করলেন প্রদ্যোৎরাজের আদ্যন্ত বিবরণ। শুনে বিম্বিসার অতি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন-‘জীবক, বেশ ভালোই করছো, ফিরে না গিয়ে বুদ্ধিমানের কাজই করেছে। সে যেরূপ উগ্র-স্বভাবের, নিশ্চয়ই অনর্থ ঘটাতো।’

এদিকে নৃপতি প্রদ্যোৎ ওষুধ সেবনের পর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করলেন। রোগমুক্ত হয়ে তিনি অত্যধিক আনন্দিত হলেন এবং জীবকের প্রতি হলেন অতিশয় প্রসন্ন। তিনি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে যথোচিত পুরস্কৃত করতে চায় জীবককে। সুতরাং তিনি দূতমুখে সংবাদ পাঠালেন-‘জীবক, আমি আরোগ্য লাভ করেছি। তুমি আমার জীবনদাতা। তোমার প্রতি আমি খুব প্রসন্ন হয়েছি। আমার একান্ত ইচ্ছা হয়েছে তোমাকে যথোচিত পুরস্কৃত করি। তুমি একবার এসো।’ জীবক দূতমুখে এ সংবাদ পেয়ে প্রত্যুত্তরে জানালেন-‘রাজন্, আমি অত্যধিক সন্তুষ্ট হয়েছি আপনার আরোগ্যের কথা শুনে। এটা আমার পক্ষে যথেষ্ট লাভ, এটাই গৌরবময় পুরস্কার। নিজকে আমি কৃতার্থ মনে করবো-আমার এ উপকার যদি আপনার স্মরণ থাকে।’

॥ বার ॥

শাক্যমুনি বৃদ্ধত্ব লাভের পর চতুর্থ বর্ষায় অবস্থান করেছিলেন রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে। এক দিবস তিনি শারীরিক অসুস্থ বোধ করায় আনন্দ স্থবিরকে বললেন- ‘আনন্দ, আমি অসুস্থ বোধ করছি; বিরেচক গ্রহণের প্রয়োজন। তুমি জীবককে ডেকে দাও।’

আনন্দ স্থবির গিয়ে জীবককে তা’ বললে, তিনি নির্দেশ দিলেন-‘তা’ হলে ভণ্ডে, কিছুদিন স্নিগ্ধ করে নিন্ ভগবানের শরীর।’

তা’ করা হলো; জীবককেও তা’ জানান গেলো। তিনি চিন্তা করলেন-‘তীক্ষ্ণ বিরেচক ভগবানের পক্ষে উপযুক্ত হবে না। মৃদু বিরেচকই প্রয়োগ করতে হবে।’ এ মনে করে তিনটি পদ্মপুষ্প যথোচিত ওষুধ প্রয়োগ করে ভগবৎ সকাশে উপনীত হলেন। তাঁর হস্তে একটা পদ্ম দিয়ে জীবক বললেন-‘ভগবান প্রথম এটার আণ নেবেন। একবার আণ নিলে- একবার বাহ্য হবে।’ এরূপে এটাতে হবে দশবার বাহ্য। তারপর এই দ্বিতীয় পদ্মের উক্ত নিয়মে দশবার আণ নেবেন। প্রতিবারে এক একবার করে দশবার বাহ্য হবে। তৎপর এই তৃতীয় পদ্ম, উক্ত নিয়মে এটায়ও হবে দশবার বাহ্য। সর্বমোট ত্রিশবার বাহ্য হবে।’ এ বলে ভগবানকে বন্দনান্তে তিনি চলে গেলেন।

বলাবাহুল্য তথাগত বুদ্ধের শারীরিক ধর্ম বা অবস্থা সাধারণ লোকের মতো নয়। সাধারণ মানুষের দেহ বিবিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত, তাই সহসা ওষুধের সম্যক ফল লাভ করা সম্ভব হয় না। সুগত-শরীর বিশুদ্ধ ও পুণ্য-পূত। তদ্ব্যতীত ওষুধের যথাযথ ক্রিয়াও হয় অতি সহসা। জীবক চলে যাওয়ার পর তথাগত পদ্ম তিনটি নিয়ে শৌচাগারে প্রবেশ করলেন এবং জীবকোক্ত মতে পদ্মের আণ নিতে আরম্ভ করলেন। প্রতিবারে এক এক ঝলক বাহ্য হতে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই উনত্রিশবার বাহ্য হলো।

জীবক বিহার-সীমা অতিক্রম করার পর তাঁর স্মরণ হলো-‘ভুল হয়েছে, ত্রিশবার বাহ্য হবার ওষুধ প্রয়োগ করা হলেও, কিন্তু হবে উনত্রিশবার। তারপর স্নান করতে হবে, স্নানান্তে হবে আর একবার’ ইহা মনে পড়াতে,

পুনরায় তিনি বিহারাভিমুখে ফিরলেন।

এদিকে সম্মুখ জীবকের মনোভাব জ্ঞাত হলেন, তাঁর দিব্যজ্ঞানের প্রভাবে। তখন তিনি আনন্দ স্থবিরকে আদেশ করলেন উষ্ণ জলের ব্যবস্থা করার জন্য। জল উষ্ণ করা হলো; এমন সময়ে জীবক এসে সুগতকে জিজ্ঞাসা করলেন-‘ভগবান, আপনার বাহ্য হয়েছে?’

‘হ্যাঁ, হয়েছে।’

জীবক নিজের ভুল স্বীকার করে বললেন-‘প্রভো, আপনার যদি উনত্রিশবার বাহ্য হয়ে থাকে, তা’হলে এখন উষ্ণজলে স্নান করুন।’

বুদ্ধ স্নান করলেন; স্নানান্তে আর একবার বাহ্য হলো।

জীবক অনুরোধ বাক্যে বললেন-‘ভগবান, যতদিন প্রকৃতিস্থ না হয় আপনার শরীর, ততদিন আমিই ব্যবস্থা করে দেবো আপনার সুপথ্যের। প্রভো, অনুগ্রহ করে আপনি এসে অবস্থান করুন আমার আম্রবন বিহারে।’

জীবকের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন তথাগত। অনুগত সেবক জীবক পরিচর্যা করলেন পরম যত্নে। অচিরেই আরোগ্য লাভ করলেন সম্মুখ।

* * * * *

এমন সময় ভিষক প্রবর লাভ করলেন অতি মূল্যবান দু'খানা বস্ত্র শিবি দেশীয়। শিবদেশে সূতাকাটায় নিপুণ রমণীরা ত্রিবিধ তন্ত্র সংযোগে অতি সূক্ষ্ম-সূতা কেটে থাকে, তদ্বারা বোনা অতি উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম-বস্ত্র। রাজা চণ্ডপ্রদ্যোৎ উপহার স্বরূপ পেয়েছিলেন এরূপ দু'খানা বস্ত্র। বস্ত্র লাভের পর স্মরণ হলো জীবকের কথা। তিনি এ মনে করে আনন্দিত হলেন যে-জীবকের মহদুপকারের কথাঞ্চিৎ হলেও প্রতিকার করা হবে, যদি তাঁকে উপটোকন দেওয়া যায় এ বস্ত্র যুগল। এতেও হবে অন্যতম কৃতজ্ঞতা স্বীকার। সুতরাং নৃপতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ জীবকের নিকট পাঠালেন-এই দুর্লভ মহার্ঘ বস্ত্র দু'খানা, পঞ্চাশত শকটপূর্ণ উৎকৃষ্ট চাউল ও ষোড়শ সহস্র রৌপ্যমুদ্রা।

জীবক বস্ত্র দু'খানা পেয়ে চিন্তা করলেন-‘এ যে দেখছি অতি উত্তম বসন। এরূপ বস্ত্র এ প্রদেশে দুর্লভ। এ বস্ত্র তথাগতের অথবা মগধরাজ বিম্বিসারের ব্যবহারযোগ্য। কিন্তু, তথাগতকে দান করাই যুক্তিযুক্ত হবে।’ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে জীবক বস্ত্র দু'খানা সঙ্গে নিয়ে সুগত সমীপে উপস্থিত হলেন। তাঁকে বন্দনান্তে অনুরোধ বাক্যে বললেন-প্রভু ভগবান, আপনার নিকট একটা বর প্রার্থনা করবো।’

বুদ্ধ বললেন-‘জীবক, তথাগত বড় দানের অতীত হয়েছেন।’

‘প্রভো, যা, নির্দোষ, যা’ বিধি সম্মত।’

‘প্রকাশ করে বলো।’

‘ভগবন, ভিক্ষুরা ধূলা, মাটি ও শ্মশান থেকে বস্ত্র সংগ্রহ করে ব্যবহার করেন। ভিক্ষুগণকে আদেশ করুন, আজ থেকে গৃহী প্রদত্ত বস্ত্রও ব্যবহার করতে। নৃপতি প্রদ্যোৎ আমার নিকট দু'খানা শিবি দেশীয় বস্ত্র উপহার পাঠিয়েছেন। তা’ বহুশত-সহস্র বস্ত্র হতেও মূল্যবান ও উৎকৃষ্টতর। আমার এ বস্ত্র দু'খানা আপনি কৃপাকরে গ্রহণ করুন।’

তথাগত গ্রহণ করলেন জীবকের প্রদত্ত বস্ত্র।

সুগতের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির বিশ বৎসর পরে প্রথমে গ্রহণ করলেন এই গৃহী-প্রদত্ত বস্ত্র। বস্ত্র-দানের চমৎকার ফল বর্ণনা করলেন সম্মুখ। দেশনা

শুনে জীবক অত্যধিক প্রসন্ন ও উৎসাহিত হলেন। সানন্দে তিনি এ সারগর্ভ-বাণী অনুমোদন করে বন্দনান্তে চলে গেলেন। অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করলেন-‘ভিক্ষুগণ, যাদের ইচ্ছা হয়, ব্যবহার করতে পারো গৃহী-প্রদত্ত বস্ত্র।

* * * * *

জীবক হলেন বুদ্ধগত-প্রাণ। তাঁর অসহ্য হতো সুগতের এক মুহূর্তের অদর্শনও। তাঁর অতি প্রিয়, একান্ত শ্রদ্ধেয় মহামানবের দর্শনেই হন তিনি হ্রষ্ট-প্রহ্রষ্ট, উৎফুল্ল। তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শুনে হন আনন্দিত, উৎসাহিত, উদ্দীপিত। তাঁর তৃষিত অন্তর হয় তখন শান্ত, তৃপ্ত, পরিপূত। একদিন ধর্ম শুনছেন জীবক গভীর একাগ্রতায়। নির্বাণপ্রদ অমৃতময়ী বাণী তথাগতের কন্মুকণ্ঠে হচ্ছে উচ্ছ্বসিত-বিশ্লেষিত-শীল সমাধি প্রজ্ঞার প্রাণস্পর্শী নিগূঢ়-তত্ত্ব দুঃখ-মুক্তির উপায়-আর্য মার্গের মর্মবাণী, তৃষ্ণাক্ষয়ের পরা-শান্তি।

জীবক অমৃত-ধর্মের অমৃতধারায় হলেন-সিক্ত, তৃপ্ত, শমিত। তথাগতের পীযুষ-বর্ষিণী বাণীর ছাপ পড়লো তাঁর মর্মস্থলে, জ্বলে উঠলো আলোকবর্তিকা, আলোকোজ্জ্বল হলো হৃদয়-কন্দর, নিখুঁত সত্যের নিগূঢ়-তত্ত্ব হলো উদ্ঘাটিত। সন্দর্শন করলেন-ঋজু, সরস ও সুন্দর নিরোধায়নের গতি-রেখা, লব্ধ হলো স্রোতাপত্তি ফল। উপলব্ধি হলো সম্যক-সত্য, আত্মস্তিক-দুঃখ নিবৃত্তির উপায় জন্ম মৃত্যুর রহস্য, উচ্ছিন্ন হলো চিরতরে ত্রিবিধ সংযোজনের মিথ্যামোহ।* [সংযোজন অর্থ বন্ধন। যে সব চৈতসিক এক জন্মের সঙ্গে অপর জন্মের বন্ধন বা শৃঙ্খল রচনা করে, প্রাণীগণকে সংসার বন্ধন করে রাখে, একেই বলা হয় সংযোজন। (১) সংকায়দৃষ্টি বা শাস্বত-আত্মায় বিশ্বাস, আত্মবাদ, (২) বিচিকিৎসা-সন্ধর্মের সন্দেহ, (৩) শীল-ব্রতানুষ্ঠান-কৃচ্ছ সাধন ও কুকুর ব্রতাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভ-বিশ্বাস। এ ত্রিবিধ সংযোজন প্রাণীদিগকে এক বন্ধন করে দুর্গতি ও হীনজন্মে। এসব সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় স্রোতাপত্তি ফল লাভের সঙ্গে সঙ্গে।]

ধন্য-রে তুই শালবতী! পতিতা-রমণী হলেও, তুই রত্নগর্ভা! তোর গর্ভজাত পুত্ররত্ন ‘জীবক’ স্রোতাপন্ন, ভিক্ষকশ্রেষ্ঠ-যিনি জগদ্দুর্লভ অদ্বিতীয় চিকিৎসক , যাঁর গৌরবময় কীর্তিকলাপ এখনও জগতে বিঘোষিত হচ্ছে উদাত্তকণ্ঠে। যিনি লোকপ্রিয়, মৈত্রী করুণার অমিয়-নির্ধর। আর এক ছিলেন তোর আত্মজা-‘শ্রীমা’। একাধারে যিনি অমিতাভ বুদ্ধের কন্যা,* [আর্যক্ষেত্রে স্রোতাপন্থা ও স্কৃদাগামিনীরূপে জন্মদাতা বলে বুদ্ধ শ্রীমার পরমপিতা, সুতরাং এ বিধানে শ্রীমা বুদ্ধের কন্যা।] দায়িকা, উপাসিকা, স্রোতাপন্থা, তথা স্কৃদাগামিনী, আর্যশ্রাবিকা।

॥ তের ॥

পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল নিবারণ মানসে এ নিবন্ধে বিন্যস্ত করা হলো শ্রীমার অপূর্ব জীবন কাহিনী-

রাজগৃহের সুপরিচিতা বারবিলাসিনী শালবতীর অন্তরে আজ জেগেছে অপরিসীম আনন্দের উচ্ছ্বাস। কারণ, সে আজ প্রসব করেছে এক অপরূপ লাভণ্যময়ী কন্যা-সন্ততি। তার মনোভাব বুঝেই যেন কোনও এক দেবকন্যা দেবপুরী ত্যাগ করে নেমে এলেন মর্ত্যে, জন্ম নিলেন ওর জঠরে। এ মেয়েটি মায়ের বড়ো সাধনার ধন।

ঐশ্বর্যশালিনী বিলাসিনী শালবতীর নয়ন-মণি স্নেহের আবেষ্টনীতে বাড়তে লাগলো অতি যত্নে শশীকলার মতো। এত শ্রী, এত রূপ ভুলোকে দুর্লভ। ‘কতো ভাগ্যবতী হলে, এমন মেয়ের জননী হতে পারে’ এ চিন্তা করে যখন শালবতী, তখন ওর বুক ভরে উঠে আনন্দে, অন্তরে জাগে পুলক-শিহরণ। এ মেয়েটি অসাধারণ শ্রীমণ্ডিতা, তাই মাতা তাকে আদর করে ডাকতে লাগলো-‘শ্রীমা’। বৎসরের পর বৎসর অতিক্রম করতে লাগলো শ্রীমা পরমসুখে। ক্রমশঃ এসে পড়লো কৈশোরে। মাতা মেয়েকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলো নানা প্রকার শিল্পকলা, ন্যায় পুরাণাদি বিবিধ শাস্ত্র। সে বিচক্ষণ বুদ্ধিমতী ও প্রখর স্মৃতি-শক্তি সম্পন্না। শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ নিপুণতার সহিত আয়ত্ত করতে লাগলো।

স্বভাবতঃ মেয়ে অনুসরণ করে মাতাকে; মায়ের চরিত্রের ছাপ পড়ে কন্যার মানস-পটে। সুতরাং নগর-শোভিনী-সুলভ সকল বিদ্যায়ও সে হলো পারদর্শিনী। ওর সর্বাঙ্গে যখন যৌবন-বসন্তের ছোঁয়া লাগলো, তখন পূর্ণমাত্রায় ফুটে উঠলো অপরূপ রূপশ্রী। লালিত্যে-মাধুর্য্যে হলো দীপ্তিময়ী, জ্যোতিষ্কের মতো।

শালবতী স্বতন্ত্র একখানা সুরম্য-প্রাসাদের ব্যবস্থা করলো মেয়ের জন্য। শ্রীমা আপন যোগ্যতায় মাতাকেও করলে অতিক্রম। ভাগ্যবানেরাই তার দর্শন লাভ করতো সহস্র মুদ্রা দর্শনী দিয়ে। বাস্তবিকই শ্রীমা বড়ো ভাগ্যবতী, পুণ্য-সংস্কার বিমণ্ডিতা।

* * * * *

তখন রাজগৃহে ছিলেন পূর্ণনামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি। আশি কোটি ধনের মালিক তিনি। মগধে তিনি শ্রেষ্ঠী বলেই খ্যাত। তাঁর এক কন্যা ছিলেন অতি রূপবতী। নাম-‘উত্তরা’। এক সময় শাক্যমুনি বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে ভাগ্যবান পূর্ণ, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে উত্তরা এ তিন জনই সাক্ষাৎ করেছিলেন স্রোতাপত্তি ফল। প্রতিষ্ঠিত হলেন নির্বাণের প্রথম স্তরে। রাজগৃহে অপর এক ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি ছিলেন-‘সুমন’। তিনিও ছিলেন শ্রেষ্ঠী অভিধায় অভিহিত। তিনি বুদ্ধমত স্বীকার করতেন না। তাই বুদ্ধের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ছিলো না। একদিন তিনি উপনীত হলেন বুদ্ধগত-প্রাণ পূর্ণশ্রেষ্ঠী-সকাশে। উদ্দেশ্য, তাঁর বিবাহ-যোগ্য পুত্রের জন্য চান পূর্ণের কন্যা উত্তরাকে। ইনি এ প্রস্তাব যখন উত্থাপন করলেন, পূর্ণশ্রেষ্ঠী আশ্চর্য হয়ে বললেন-‘তা’ কি সম্ভব! আপনাকে কিরূপে দিতে পারি আমার মেয়ে! তা’ কখনো হতে পারে না।’

সুমনশ্রেষ্ঠী বিস্ময়-কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন-‘কেন! কেন দিতে পারেন না?’ ‘ভগবান তথাগতের প্রতি আপনি শ্রদ্ধাহীন। তাঁর বিরুদ্ধ-মতের পরিপোষক আপনারা। আমার মেয়ে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবতী। সে কখনো পারবে না বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের দান না দিয়ে, ধর্ম না শুনে। সুতরাং আপনার পুত্রকে মেয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রেষ্ঠী সুমন মৃদু হেসে বললেন- ‘মাত্র এ কারণ? এর জন্য আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন; এতে আপনার মেয়ের অবারিতদ্বার। যথাভিরূচি সম্পাদন করতে পারবে দান-ধর্ম পুণ্যকার্য।’

তবুও আপনারা অন্যমতাবলম্বী, আপনাদের ঘরে আমার মেয়ে শান্তি পাবে না।’ অনেক অনুরোধ করার পরও সুমনের অনুরোধ রক্ষা না হওয়ায়, অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন তিনি। কিন্তু, করলেন না সম্পূর্ণ আশা ত্যাগ। তিনি রাজগৃহের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় পূর্ণের ভবনে উপস্থিত হলেন। সকলের একান্ত অনুরোধ পূর্ণ আর ‘না’ বলতে পারলেন না। মেয়ে সম্প্রদান করার সম্মতি দান করলেন।

অতঃপর আষাঢ়ী পূর্ণিমার শুভলগ্নে শুভবিবাহ হয়ে গেলো। বড় লোকের আড়ম্বর যা' হবার, কোনো দিকে এর ন্যূন হয়নি। উত্তরা ভদ্র, নম্র, সরল ও জ্ঞানবতী। নারীর যা' সদগুণ থাকা প্রয়োজন, সে' সব গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন উত্তরা। এক কথায় বলতে গেলে-তিনি ছিলেন নারী কুলের উজ্জ্বলরত্ন। স্বামীর মনসস্তৃষ্টির জন্য সতত যত্নপর থাকতেন তিনি। পতির সন্তোষ বিধান করতে গিয়ে মোটেই অবসর পান না ধর্মাচরণের। শ্রেষ্ঠপুত্র মনোমত পত্নী পেয়ে তাঁকে করতে চান না চোখের অন্তরাল। থাকতে চান-অহর্নিশ রূপ-সাগরে মগ্ন হয়ে। উত্তরাই যেন তাঁর-স্বর্গ, সুখের মন্দাকিনী, কল্পলতার অমৃতফল। মোহগ্রস্ত যুবকদের স্বভাব এরূপই। তখন ভুলে যায় তারা আপন কর্তব্য, ধর্মে-কর্মে হয় উৎসাহ হীন, মাতা-পিতার প্রতিও হয় উদাসীন। মনে করে পত্নীই সত্য-শাস্ত; আর সব মিথ্যা-অশাস্ত।

উত্তরা কিন্তু এর বিপরীত। তিনি স্রোতাপন্ন-চিন্তে উপলব্ধি করেছেন-রূপ যৌবন জল-বুদবুদের মতো অধ্রুব, কামনা-বাসনার পশ্চাতে রয়েছে অনন্ত-দুঃখ, তৃষ্ণা মৃগতৃষ্ণিকার মতে প্রপঞ্চময়ী, দুঃখদায়িনী। তৃষ্ণার মূলোচ্ছেদ হয় আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি। রোধ হয় জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ। উত্তরা নৈর্বাণিক সত্যের পূজারী; বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘগত প্রাণ; রত্নত্রয়ের উপাসিকা। আড়াই মাস যাবৎ তিনি মহামানব বুদ্ধ ও আর্যসংঘের দর্শন লাভে বঞ্চিত। দান ও ধর্মশ্রমণ তো দূরের কথা স্বামী তাঁকে সে' সুযোগ দানে বিমুখ। তাই তিনি মর্যাস্তিক দুঃখে হয়েছেন সন্তপ্ত, পীড়িত, অভিভূত। নির্জনে বক্ষঃ ভেসে যায় তাঁর চক্ষের জলে। একদিন বিধুরা বালা জানালেন পিতাকে তাঁর অন্তরের ব্যথা-‘বাবা, এহেন দুঃসহ অঙ্ককূপে কেন আমায় নিষ্কেপ করলেন? এখানে আসা অবধি আর্যদের দর্শন অথবা কোনও একটা কুশলধর্ম করা আমার অদৃষ্টে ঘটেনি। এ অঙ্ককারার দারুণ-দুঃখ আমার অসহ্য হয়েছে। বরং এটাই ভালো ছিলো-আমার রূপ নষ্ট করে দাসিবৃত্তিতে নিয়োগ করা।’

মেয়ের এরূপ মর্যাস্তিক দুঃখের সংবাদ পেয়ে, পিতা পূর্ণশ্রেষ্ঠীর স্রোতাপন্ন চিন্তে বড়ো আঘাত লাগলো। সম্বরণ করতে পারলেন না তিনি চক্ষের

জল। বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে এরূপ খেদোক্তি করলেন তিনি-‘আহঃ, মেয়ে আমার বড়ো দুঃখেই কালাতিপাত করছে। এরূপ যে হবে, তা’ আমি তখনই ভেবেছিলাম।’ এ বলে তিনি পনের হাজার মুদ্রা মেয়ের নিকট পাঠিয়ে বললেন-‘এ নগরে অবস্থান করছে শ্রীমা নাম্নী গণিকা। দৈনিক সে গ্রহণ করে সহস্র মুদ্রা। পনের হাজার মুদ্রার বিনিময়ে তাকে পনের দিনের জন্য নিযুক্ত কর তোমার স্বামীর পাদচারিকা। ততদিন তুমি সম্পাদন কর ইচ্ছানুরূপ কুশলকর্ম।’

উত্তরার আহ্বান পেয়ে যথা সময়ে উপস্থিত হলো শ্রীমা। উত্তরা তাকে সাদর সম্ভাষণে বললেন- প্রিয় সহায়িকা শ্রীমা, তুমি পনের দিন আমার স্বামীর পরিচর্যা করে তাঁর সন্তোষ বিধান করো, এর বিনিময়ে তোমায় দেবো দৈনিক সহস্র মুদ্রা।’

শ্রীমা সানন্দে সম্মত হলো। তাকে সঙ্গে নিয়ে উত্তরা উপনীত হলেন স্বামীর নিকট। শ্রেষ্ঠপুত্র শ্রীমাকে দেখে চমৎকৃত হলেন। চেয়ে রইলে বিহ্বল-নেত্রে। ‘এ কেমন রূপ, এ কেমন মাদুর্যময়ী নারী, কী অপরূপ লালিত্য! এমন অপূর্ব রূপ, এমন যৌবনশ্রী মণ্ডিতা রমণী তো’ আর চোখে পড়েনি!’ বিস্ময়পূর্ণ অন্তরে চিন্তা করলেন শ্রেষ্ঠপুত্র। শ্রীমাকে যত দেখেন, তত হন অনুরক্ত, মোহগ্ৰস্ত। উত্তরাগত প্রাণ স্বামীটির এ কি অবস্থা হলো? উত্তরার আসনে কেন জাঁকিয়ে বসলো শ্রীমা? আশ্চর্য বটে, এত প্রেম, এত ভালোবাসা ক্ষণেকেই মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেলো! ছিঃ, কামান্ধ যুবক! হৃদয় তোমার এত ভগ্নুর, এত অবাস্তব, এত অবিশ্বস্ত স্বামী জিজ্ঞাসা করলে সমুৎসুক হয়ে ‘এ কে?’

উত্তরা মৃদু হেসে বল্লেন- ‘আপনার পদ-সেবিকা নগর-সুন্দরী শ্রীমা। আমার এই সহায়িকা এক পক্ষকাল আপনার সেবা করবে। ততদিন আমি অবসর নিতে চাই।

শ্রীমার নাম শুনে শ্রেষ্ঠপুত্র চমৎকৃত হলেন। চিন্তা করলেন-‘বাঃ, শ্রীমাকে আজ চোখের দেখা দেখলাম। এতদিন শুনে আসছি এর রূপেশ্বরের কথা, এখন দেখলাম স্বচক্ষে। যা’শুনেছি, তা’ ঠিকই বটে!’ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন পত্নীকে-‘তুমি অবসর নেবে কেন?’

‘আমি ব্রহ্মচারিণী হবো।’

‘তুমি কি আমার সঙ্গে কৌতুক করছো?’

‘কৌতুক নয় স্বামীন, সত্যই বলছি, এ পনরদিন আমি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘে দান দেবো, ধর্মবাণী শুনবো, অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল পালন করবো।’

‘অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল কিরূপ?’

‘প্রাণীহত্যা, চুরি ও পুরুষস্পর্শ করবো না; মিথ্যা কখন, মাদকদ্রব্য সেবন ও বিকাল-ভোজন থেকে বিরত থাকবো; নাচ দেখবো না, গান-বাজনা শুনবো না; মালাদি বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার করবো না; সুগন্ধ-দ্রব্য গায়ে মাখবো না, আর বিলাস-শয্যার শয়ন করবো না, পালন করবো ব্রহ্মচারিণীর ব্রত।’

শ্রেষ্ঠপুত্র হেসে উঠলেন, বললেন-‘তাই না-কি? তাঁর মন তখন ভরে উঠলো আনন্দে। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য হলেও লাভ করবেন তার কামনার কামিনী অনিন্দ্য-রূপসী শ্রীমাকে। কিন্তু, মনোভাব গোপন রেখে বললেন-তবে আমার উপায় কি?’ ‘কেন? আমার সহায়িকা তো আছে? সেই আপনার পরিচর্যা করবে।’

স্বামী কপট-বিমর্ষে বললেন-‘সে কি তোমার মতো মনোরঞ্জিনী হবে?’ বুদ্ধিমতী উত্তরা স্বামীর মনোভাব উপলব্ধি করলেও, কিন্তু তা’ গোপন রেখে বললেন-‘স্বামীন্, শ্রীমা এ বিষয়ে খুব নিপুণ, সে নিশ্চয়ই আপনার চিত্ত বিনোদন করবে আশা করি।’

‘এ কয়দিন তুমি কোথা থাকবে?’

‘ভয় নেই, পালিয়ে যাবো না; থাকবো এই প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যেই।’ স্বামী আনন্দ ভাব দেখিয়ে বললেন-‘বেশ, এখানেই থাকো; যা’ করতে চাও, এখানেই করো। মনে থাকে যেন, তোমার অবকাশ মাত্র পনরদিন, এর যেন ব্যতিক্রম না ঘটে।’

উত্তরার একান্ত অভিলাষ পূর্ণ হলো। শ্রীমার প্রতি তিনি অত্যধিক প্রসন্ন হলেন। তাঁর মহাকল্যাণ, মহোপকার সাধন করেছে সে। শ্রীমাকে আলিঙ্গন করে জানালেন তাঁর আন্তরিক প্রীতিভাব। স্বামী সেবায় তাকে

নিযুক্ত করে দাসীদের সঙ্গে নিয়ে মনানন্দে গেলেন বিহারে। পুণ্যপুরুষ তথাগতের দর্শন পেয়ে তাঁর অন্তরে কী যে আনন্দের সঞ্চার হলো, তা' অবর্ণনীয়। প্রসন্নমনে অভিনিবেশ সহকারে শুনলেন শান্তার অমৃতোপম ধর্মোপদেশ। অতঃপর প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে গিয়ে প্রীতিনেত্রে দর্শন ও বন্দনা করলেন ভিক্ষুসংঘকে। গৃহে প্রত্যাবর্তন সময় ভগবানকে বন্দনা করে অনুরোধ জানালেন-মহাপ্রবারণা (আশ্বিনী পূর্ণিমা) পর্যন্ত প্রতিদিন তাঁর সেখান থেকে অনুভিক্ষা গ্রহণের জন্য। বুদ্ধ তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। প্রত্যহ দান দিয়ে, ধর্ম শুনে, উপোসথ-শীল রক্ষা করে অপার আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন উত্তরা।

দেখতে দেখতে এসে পড়লো মহাপ্রবারণার উৎসব। আগামীকল্য সেই পবিত্র তিথি। এই শুভদিনে উত্তরার নির্ধারিত স্থানে আহার করবেন সশিষ্য বুদ্ধ। তাই তিনি আজ আনন্দে মেতে উঠেছেন। নানাপ্রকার পিষ্টকাদি রসাল খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুতির চলছে সমরোহ। উত্তরা নির্দেশ দিচ্ছেন সব কিছুরই। বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ বসবেন যে ঘরে, তা' সজ্জিত হচ্ছে মনোরম উপাদানে। পত্র পল্লব ও ধ্বজা-পতাকায় হচ্ছে সুসজ্জিত। এরূপ নানাকাজে ব্যস্ত লোকদের বাক্যালাপের শব্দ শুনে শ্রেষ্ঠীপুত্র সমুৎসুক হয়ে দেখলেন বাতায়ন পথে। প্রথম তাঁর নয়ন-গোচর হলো উত্তরা। ভস্মাকীর্ণ, মসীলিপ্ত, ঘর্মাক্ত-কলেবর উত্তরা কাজে বড়ো ব্যস্ত। 'কী মূর্খ-নারী, এমন সুখময় বিলাসপূর্ণ শ্রীসম্পদ ভোগ না করে, শ্রমণদের দান দেবার জন্য এ কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে!' চিন্তা করলেন শ্রেষ্ঠীপুত্র। হাসলেন অবজ্ঞার হাসি। তারপর মুখ ফেরালেন শ্রীমার দিকে। তখনও তাঁর মুখে রয়েছে সে হাসির রেখা। তা' দেখে চমকে উঠলো শ্রীমা। চিন্তা করলো- 'আমার স্বামী হাসছে কেন? কি দেখলো বাতায়ন পথে? সত্বর উঠে এসে দেখলো; দেখা পেলো উত্তরার। দেখেই ঈর্ষানল জ্বলে উঠলো তার। চিন্তা করলো ক্ষুব্ধ অন্তরে- 'নিশ্চয়ই আছে আমার স্বামীর সহিত এর গুপ্ত প্রণয়! এখনি এর উচিত শাস্তি দেবো একে।' ক্রোধ-কম্পিত দেহে দ্রুত দ্বিতলের সোপান অতিক্রম করে নেমে আসতে লাগলো সে।

মোহ সকল-অকুশলের মূল। তা মনশ্চক্ষুঃকে করে অক্ষীভূত। ব্যর্থ করে দেয় সত্যদৃষ্টিকে। অন্ধকার যেমন আলোকের অভাবাত্মক মোহও তেমন প্রজ্ঞার অভাবাত্মক। মোহ জানতে দেয় না সম্যক সত্যকে। শ্রীমা যে পতিতা-নারী, সে যে এখানে এসেছে মাত্র পনের দিনের জন্য, শ্রেষ্ঠীপুত্র যে ওর সম্পর্কে কেউ নয়, এই বোধ-শক্তিকে আচ্ছাদন করে রেখেছে দারুণ-মোহ। তাই মোহের অপর নাম-অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান। এ মিথ্যা জ্ঞানের বশবর্তী হয়ে মানুষ কত যে, পাপকর্ম সম্পাদন করে, এই ইয়ত্তা নেই। শ্রীমা নেমে এসে কি করলো? তখন উনানে সিদ্ধ হচ্ছিলো পিষ্টক। এক বড় চামচ-পূর্ণ ফুটন্ত-যুষ উত্তরার মন্তকে ঢেলে দিলো। এতে দন্ধ হলেন না উত্তরা। অপিচ, তা অনুভূত হলো শীতল জলের মতো। এর কারণ কি? এর একমাত্র কারণ হলো-‘উত্তরার স্রোতাপন্ন-চিত্তে অপরিমেয় মৈত্রী বিদ্যমান ছিলো শ্রীমার প্রতি। উত্তরা কৃতজ্ঞচিত্তে সর্বদা চিন্তা করেন-‘এই শ্রীমা আবার মহাউপকারিণী। একমাত্র এর সহায়তায় এসব কুশলকর্ম সম্পাদন করতে পারছি। এ সহায়িকার গুণ সুবিস্তৃত পৃথিবীর চেয়ে ও মহৎ, ভবাথ হতেও উচ্চতর।’

আজ শ্রীমার অবস্থা ও কার্যকলাপ দেখে তিনি চিন্তা করলেন ‘এর প্রতি আমার অন্তরে যদি বিন্দুমাত্রও ক্রোধোৎপন্ন হয়ে থাকে, তবে এই ফুটন্ত-জল আমার দন্ধ করুক, অন্যথায় দন্ধ না করুক।’ এতৎসঙ্গে উৎপন্ন করলেন অপরিসীম মৈত্রী-চিন্ত। মৈত্রীর প্রভাবে পড়ে শীতলতা প্রাপ্ত হলো ফুটন্ত জল। মৈত্রী শক্তি ঋদ্ধিশক্তির মতো বিস্ময়কর।*

[যাঁরা মৈত্রী ভাবনা করেন, পুনঃ পুনঃ ভাবনা করেন, ভাবনা বৃদ্ধি করে সমগ্র জগতের সকল প্রাণীর প্রতি বৈরিতাশূন্য অপ্রমেয় মৈত্রীচিন্ত উৎপন্ন করেন, সেই মৈত্রী পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ একাদশ প্রকার আশ্চর্য ফলের অধিকারী হন। যথা- সুখ-নিদ্রা হয়, ব্রহ্মমূহুর্তে সুখে জাগ্রত হন, পাপ-স্বপ্ন দেখেন না, মনুষ্য ও অপদেবতার প্রিয় হন, দেবগণ রক্ষা করেন, অগ্নি দন্ধ করে না, বিষক্রিয়া নষ্ট হয়, অস্ত্রাঘাত ব্যর্থ হয়, সহসা চিত্ত সমাধিস্থ হয়, মুখবর্ণ প্রসন্নোজ্জ্বল হয়, সজ্ঞানে মৃত্যু হয়, অর্হৎ হতে না পারলেও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে। (মৈত্রীসূত্র)]

শ্রীমা বিস্ময়-নেত্রে দেখলো-উত্তরা অচঞ্চল, ভাবান্তর-রহিত, প্রসন্নোজ্জ্বল মুখমণ্ডল, মৃদুহাসির অপূর্ব রেখা। চিন্তা করলো শ্রীমা- ‘কি হলো, হিম-শীতল হয়ে গেলো না-কি এ জল! তখনি সে আর এক চামচ ফুটন্ত জুস নিয়ে তাড়াতাড়ি উত্তরার মস্তকে দিতে যাচ্ছে, এমন সময় দাসীরা দ্রুত এসে তাকে ধরলো সজোরে, বললো সকলে রোষ-কষায়িত তীব্র দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে-‘কে-রে তুই? দুষ্টা, দুর্বিনীতা, শৌণ্ডিকা, তোর স্পর্ধা কেমন? বলে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর উপর এবং তাকে মাটিতে ফেলে প্রহার ও পদাঘাত করতে লাগলো।

উত্তরা তাড়াতাড়ি উঠে সকলকে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও কেউ মানলো না। অগত্যা তিনি আপন শরীর দিয়ে তাকে ঢেকে রাখলেন। দাসীরা এবার ক্ষান্ত হলো বটে, কিন্তু বৈশ্যা-গণিকা ইত্যাদি বলে তীব্র-কটুক্তি করতে লাগলো। উত্তরা সকলের নিকট ক্ষমা চাইলেন, আর যেন তারা এরূপ কিছু মন্দ-বাক্য না বলে। তিনি অতি মমতায় অন্তরে শ্রীমাকে তুলে গায়ের ধূলা ঝেড়ে দিলেন, উষ্ণোদকে স্নান করালেন, মস্তকে দিলেন শতপাক তৈল।

এ সময়ে উত্তরা করুণা-বাক্যে বললেন-‘বোন, বড়ো অন্যায় করেছো তুমি। এসেছো মাত্র পনের দিনের জন্য, কি করে তা’ ভুলে গেলে, ইত্যাদি মমতাপূর্ণ বাক্যে দিলেন উপদেশ। অদ্যকার এ ব্যাপারে শ্রীমার ‘মোহাস্কতা, আত্মস্তরিতা, আত্মবিস্মরণতা অপসারিত হলো। বুঝতে পারলো-সে এ গৃহের কেউ নয়; বাইরের হেয়-নারী মাত্র। আরো বুঝলো, উত্তরার অসাধারণ গুণ। সুতরাং তাঁর প্রতি অত্যধিক প্রসন্ন হলো শ্রীমা, প্রগাঢ় শ্রদ্ধায়ও হলো অন্তর পরিপূর্ণ। নিজের অপরাধ উপলব্ধি করলো মর্মে-মর্মে। অনুতপ্ত হৃদয়ে তখনি সে ক্ষমা প্রার্থনা করলো উত্তরার চরণদ্বয়ে মস্তক রেখে। উত্তরা বললেন-‘ওঠো বোন, আমি তো এখন ক্ষমা করতে পারবো না, আমার পিতা যদি ক্ষমা করেন, তবে আমিও ক্ষমা করবো’।

‘তাই হোক বোন, ক্ষমা চাইবো তোমার পিতা পূর্ণশ্রেষ্ঠীর নিকটও।’

‘না, না, তিনি নন্, তিনি কেবল জনক মাত্র। যিনি আমার সংসার

দুঃখের অন্তকারী তিনিই আমার পরম-পিতা। তিনি হলেন- ভগবান সম্যক্-সম্মুদ্র। যিনি আমার জন্ম দিয়েছেন-আর্যক্ষেত্রে আর্যরূপে। যে'জন্ম- শ্রেষ্ঠজন্ম, অলৌকিক অমৃত-সাগর, দুঃখ মুক্তির নিয়ামক, শমন-দমনের খরশান প্রহরণ। এমন সুদুর্লভ জন্ম যিনি দান করেছেন আমায় সেই আমার পরম পিতা। পুণ্যপুরুষ সম্মুদ্র ক্ষমা করলে তোমায়, আমিও করবো ক্ষমা।' উত্তরার এ কথা বলার মাধ্যমে রয়েছে তথাগতের সহিত শ্রীমার সাক্ষাৎ করে দেওয়ার উদগ্র-বাসনা। এতে যদি হয় ওর জ্ঞান-মুকুল প্রস্ফুটিত। কার অন্তরে যে, কোন মহাশক্তির অঙ্কুর অঙ্কুরিত হয়ে রয়েছে, তা' কে জানে?

শ্রীমা অবাক হয়ে শুনছে উত্তরার কথা। তাঁর কথার পরিসমাপ্তি হলে, সে বললো-‘বোন, ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই।' তজ্জন্য চিন্তা করো না, আমি পরিচয় করিয়ে দেবো। তিনি আসবেন কাল সশিষ্য আমার এখানে আহার করতে। তুমি যা' পারো খাদ্য-ভোজ্য নিয়ে কাল যথাসময়ে এখানে এসো।'।

শ্রীমা সসঙ্কোচে বললো-‘সেই পুরুষোত্তম বুদ্ধ আমার দেওয়া সামগ্রী আহার করবেন কি?

‘তিনি এ ছুঁমার্গের বহু উর্ধ্বে; আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ, পতিতা-অপতিতা তাঁর নিকট একপ্রকার। তুমি নিঃসঙ্কোচে নিয়ে এসো আহাৰ্য বস্তু।' শ্রীমা সানন্দে বললো-‘হ্যাঁ তা' হলে আমি নিয়ে আসবো।' এ বলে শ্রীমা স্বগৃহে গিয়ে প্রচুর রসাল খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করলো এবং পরদিবস যথাসময়ে তা'নিয়ে উপস্থিত হলো উত্তরার গৃহে।

উপাসিকা উত্তরার নিমন্ত্রণ রক্ষাকল্পে সমাগত হলেন সশিষ্য বুদ্ধ। সুসজ্জিত গৃহে মহার্য আসনে সমাসীন হলেন বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ। শ্রীমা সুগত-সমীপে যেতে সাহস করলো না। উত্তরা নির্দেশ করলে-‘যাও বোন, তোমার আহাৰ্য-বস্তু ভগবান ও ভিক্ষুগণের পাত্রে পরিবেশন করো গিয়ে।'।

‘না বোন, আমি পারবো না। এমন সৌম্য, জোতির্ময় মহাপুরুষের সম্মুখে যেতে আমার ভয় হচ্ছে। আর আমার দেওয়া আহাৰ্য তাঁরা যদি

গ্রহণ না করেন।’

‘কি বলছো শ্রীমা! তোমার বিচার-বুদ্ধি অতি সংকীর্ণ। এসব লোকাভিত আর্য়গণ তোমার পরিজ্ঞাত নয়। এঁরা মানুষকে ঘৃণা করেন না, পাপকেই ঘৃণা করেন। কেবল মানুষ নয়, কীটানুকীটের প্রতিও এঁদের অপরিসীম মৈত্রী করুণা। তুমি কেন ভয় করছো। এমন মৈত্রী-করুণার প্রতীক পতিত-পাবন মহামানব কি ভয়ের পাত্র? যাঁরা ভয়ত্রাতা, তাঁদেরই করছো ভয়, আশ্চর্য বটে! আমার সঙ্গে এসো, উভয়েই করবো পরিবেশন।’

উত্তরার কথায় সাহস পেয়ে শ্রীমাও সানন্দে যোগদান করলো পরিবেশনে। আহা-কৃত্যের অবসানে সসঙ্কোচে শ্রীমা এসে তথাগতের পদপ্রান্তে মস্তক রেখে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। সুগত জিজ্ঞাসা করলেন-‘তোমার অপরাধ কি?’

সে সভয় ও সসঙ্কোচে প্রকাশ করলো পূর্বদিনের সমস্ত ঘটনা। পরিশেষে বললো-‘ভগবন, আমি উত্তরার প্রতি করেছি গুরুতর অপরাধ। এর মস্ত কে ঢেলে দিয়েছি ফুটন্ত যুষ। তবুও সে আমার প্রতি বৈরীভাব পোষণ করেনি। পূর্ণ মৈত্রীভাবই রয়েছে বিদ্যমান। এ করুণাময়ীই আমায় রক্ষা করেছে দাসিদের হাত থেকে। এ যে মহীয়সী নারী, রমণীকুলের উজ্জ্বল-রত্ন, এটা আমি অনুভব করছি মর্মে মর্মে। আমি এখন যার-পর নাই অনুতপ্ত, অপরাধের ক্ষমা প্রার্থিনী। আপনি আমায় ক্ষমা করলে, সেও ক্ষমা করবে।’

তথাগত উত্তরাকে জিজ্ঞাসা করলেন-‘উত্তরা, এ কথা কি সত্য?’

‘হ্যাঁ প্রভো, সবই সত্য।’

‘যখন ফুটন্ত যুষ ঢেলে দিচ্ছিলো, তখন তুমি কি চিন্তা করেছিলে?’

‘প্রভো, এর প্রতি আমি অপ্রমেয় মৈত্রীভাব উৎপন্ন করেছিলাম।’ ‘সাধু, সাধু উত্তরে, ক্রোধকে জয় করতে হয় এরূপেই।

অক্লোথেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে,

জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং’তি

ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা, অসাধুকে সাধুতার দ্বারা, কৃপণকে দানের দ্বারা ও মিথ্যাকে সত্যের দ্বারা জয় করতে হয়, ইত্যাদি বিশ্লেষণ করতে

গিয়ে অমিতাভের সুমধুর ব্রহ্ম-কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠলো চিরসুন্দর আৰ্যসত্যের নিগূঢ়-তত্ত্ব উদঘাটন কল্পে ।

এমন সারগর্ভ পীযুষ-বর্ষিণী বাণী শুনতে শুনতে শ্রীমার অন্তরে এমন এক অপূর্বভাবের সৃষ্টি হলো-যা বর্ণনাতে । যার প্রভাবে উপলব্ধি হলো-রূপ যৌবন ও দেহের অসারত্ব-অনিত্যত্ব । মনশ্চক্ষুর গোচরীভূত হলো সত্য-মিথ্যার স্বরূপ, অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়লো কামপরিভোগের পরিণাম ফল । অধিগম হলো সম্যক্ জ্ঞান । বারবিলাসিনী শ্রীমা হলেন-স্রোতাপন্থা* । [স্রোতাপন্থের পঞ্চবিধ সংযোজন ধ্বংস হয়, আর তা' উৎপন্ন হতে পারে না । যথা-সৎকায়দৃষ্টি (আত্মবাদ), বিচিকিৎসা (সদ্ধর্মে সন্দেহ), মিথ্যাশীল ও মিথ্যাব্রতে মোহ (যা' সম্যক্ শীলব্রত নয়, তা' সম্যক্ মনে করে তৎপ্রতি শ্রদ্ধাপ্রবণ হওয়া), ঈর্ষ্যা ও মাৎস্যর্যা ॥ অসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি ও আনন্দে হলো তাঁর অন্তর পূর্ণ, পরিপূত । তথাগতের চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে জানালেন তাঁর উচ্ছ্বাসময় আবেগ বাণী-‘ভগবন্, এতোদিন আপনাকে জানি নি, বুঝিনি সত্যধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব । প্রভো, আপনি দিয়ে দিলেন আজ অমৃতের সন্ধান, এবার আমায় ক্ষমা করুন ।

‘ওঠো উপাসিকা, তোমাকে প্রথমেই ক্ষমা করেছেছি ।’

অতঃপর শ্রীমা উত্তরার পায়ে মস্তক রেখে বললো-‘বোন, তুমি আমার অগ্রজা, জ্যেষ্ঠা ভগ্নি, তুমি আমায় ধর্মসুধা পান করালে, তুমি আমার মহাউপকারিনী । আমি ঘোর অপরাধিনী । বোন, আমায় ক্ষমা করো ।’ ‘ওঠো শ্রীমা, আমার পিতা যখন ক্ষমা করেছেন, তখন আমিও করেছেছি ।’ অতঃপর শ্রীমা আগামী দিবসের জন্য শিষ্য বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করলেন । পরদিন এ মহাদানের অবসানে সুগতসমীপে প্রার্থনা করলেন-প্রত্যহ যেন আটজন ভিক্ষু এসে তাঁর নিকট অনুভিক্ষা গ্রহণ করেন । তথাগত মৌনাবলম্বনে সম্মতি জানালেন । এ দান প্রবর্তিত হয়েছিলো শ্রীমার অন্তিম-দিবস পর্যন্ত । শ্রীমা অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেছিলেন বিরাগিণী হয়ে, ব্রহ্মচর্য ব্রত প্রতিপালন করে আত্মনিয়োগ করেছিলেন দান শীল ভাবনায়, প্রজ্ঞার সাধনায় ।

অনিত্যময় সংসারে শ্রীমাও প্রাপ্ত হলেন অনিত্যত্ব । একদিন তাঁর

পরমায়ুর হলো অবসান। সে'দিন ভিক্ষুগণকে পূর্বাহ্নে আহার্য বস্ত্র দান করে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অপরাহ্নে নশ্বর-দেহ ত্যাগ করে আবির্ভূত হলেন 'তাবতিংস' দেবপুরে। লাভ করলেন জ্যোতির্ময় দিব্যদেহ, পুণ্যঋদ্ধিময় দিব্যসম্পদ।

মগধরাজ বিম্বিসার ভগবান বুদ্ধের নিকট সংবাদ পাঠালেন-‘ভিক্ষু-শ্রেষ্ঠ জীবকের কনিষ্ঠা-ভগ্নী শ্রীমার মৃত্যু হয়েছে।’ তা'গুনে সম্মুদ্র রাজার নিকট সংবাদ পাঠালেন-‘এখন যেন সম্পন্ন করা না হয় শ্রীমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। শ্মশানে সুরক্ষিত হোক ওর মৃতদেহ। সতর্ক থাকতে হবে কাক-শৃগালাদি যেন শবের কোনও ক্ষতি না করে।’

যথাযথ প্রতিপালিত হলো মহামানবের নির্দেশ। চতুর্থদিন দেখা গেল-মৃতদেহ হয়েছে অত্যধিক স্ফীত ও নীলবর্ণ, নবদ্বারে বের হচ্ছে উৎকট দুর্গন্ধময় ন্যাকারজনক অশুচিরস। রাজা এবার ভগবানকে জানালেন শবদেহের এ অবস্থার কথা।

ভগবান নির্দেশ দিলেন-‘রাজগৃহের সমস্ত লোক যা'তে মশানে উপস্থিত হয়, সেরূপ ব্যবস্থা করা হোক।’ রাজাদেশে মশানে সমবেত হলো সমগ্র নগরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা। সুবিস্তৃত মশান-ভূমি হলো লোকে লোকারণ্য। যথা-সময় সুগত ভিক্ষুগণ পরিবৃত্ত হয়ে মশানে সমাগত হলেন। পুণ্যপুরুষ তথাগতের আগমনে জনসংঘ হলো নীরব-নিমুদ্র। সকলেই রইলো উৎকর্ণ হয়ে, অনুত্তর শাস্তার শ্রীমুখে কিরূপ অপূর্ববাণী নিঃসৃত হয়, তাই শোনার জন্য। চতুর্দিকে মুখর করে সুমধুর ব্রহ্মস্বরে সম্মুদ্র প্রশ্ন করলেন রাজাকে-‘মহারাজ, এটা কার মৃতদেহ?

‘প্রভো, জীবকের অনুজা শ্রীমার।’

‘এ'ই কি শ্রীমা?’

‘হ্যাঁ প্রভো।’

‘তা হলে মহারাজ, ভেরী-শব্দে সমবেত জনসংঘকে জানিয়ে দিন এখানে এমন কোন অনুরাগী যদি থাকে, তবে শ্রীমাকে সে গ্রহণ করুক, সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে।’

ভেরী শব্দে ঘোষণা করা হলো এই অপূর্ব কথা। এ কথা শুনে অবাক

হলো জনগণ। সকলে নীরব, কেউ কোনো কথা বললো না। রাজা জনসংঘের অবস্থা বুঝকে জানালে, তিনি বললেন-‘তা’ হলে পঞ্চশত মুদ্রায় নিতে বলুন।’ পুনরায় তা’ ঘোষণা করা হলো। কিন্তু, এবারও সবাই নীরব কেউ নিতে রাজি নয়। অতঃপর অনুক্রমে মুদ্রা হ্রাস করে এক কড়ায় নেমে আসা হলো, তবুও কেউ ইচ্ছুক নয়। পরিশেষে বিনামূল্যেও যখন কেউ নিতে ইচ্ছা করলো না, তখন সম্মুখ সেই মশানক্ষেত্র মুখর করে মেঘমন্দ্রস্বরে বিশ্লেষণ করলেন অনিত্যত্বের মর্মবাণী-‘ওহে সমবেত জনসংঘ, এ রাজগৃহে যে’ শ্রীমা ছিলো শ্রেষ্ঠ রূপসী, অপরূপ লালিত্যময় যার অঙ্গসৌষ্ঠব, ভ্রমর-কৃষ্ণ সুদৃশ্য কেশদাম, মনোরম কুন্দদন্ত, শোভনমোহন মৃগনয়ন, কমণীয় মুখের অপূর্ব লাবণ্যচ্ছটা, সুললিত কণ্ঠের সুরের আমেজ, ছন্দের দোলা, নৃত্যের হিল্লোল, কটাক্ষের মদালসাময় পূর্ব শোভাদর্শন কামনায় লালায়িত ছিলো জনগণ; দৈনিক যার দর্শনী দিতে হতো সহস্র মুদ্রা, তবুও তাকে লাভ করা ছিলো কষ্টসাধ্য, এরূপ নারীর আজ কেন এ পরিণতি! তাকে কেউ চায় না আজ বিনামূল্যেও! আজ কেন জনগণ ঘৃণায় কুণ্ডিত করেছে নাসিকা! প্রত্যেকেই দেখো অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে- রূপের অনিত্যত্ব দেহের অসারত্ব।

মানব-মন তৃষ্ণায় জর্জরিত, প্রপীড়িত। তৃষ্ণা সতত আহ্বান করেছে অনন্ত দুঃখকে, জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহকে। সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়। জীবনে শুধু দুঃখ, শুধু ক্লেশ, শুধু অশ্রু, শুধু ব্যথা। মোহাক্ষ মানব দুঃখময় মরুকান্তারে সুখের মায়া-মরীচিকা দেখে ভ্রান্ত হয়, বিহবল হয়। জীবন যে’খানে মৃত্যু-কালিমায় পরিম্লান; রোগ শোক, দারিদ্র্য যেখানে শত দংশনে করছে ক্ষত-বিক্ষত, মানব সেখানে কিরূপে করে সুখের পরিকল্পনা! জগতে সব কিছুতেই দুঃখের সুরই রণিত হচ্ছে। মোহমুগ্ধ মানবই অহংবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন।

যা’ নিজস্ব নয়, তাও আমার-আমার বলে দৃঢ়-বন্ধনে বাঁধতে চায়। মনশ্চক্ষে দর্শন করো অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মের স্বরূপ।’ এতদূর বলে সুগত নীরব হলেন।

তথাগতের এ সারগর্ভ দেশনা হলো সার্থক। জনৈক ভিক্ষু শ্রীমার প্রতি বড়ো মমতা পরায়ণ ও প্রসন্ন ছিলেন, তাঁর রূপাদি দর্শনেও প্রীতি লাভ করতেন। তিনি এ দেশনা শুনে ত্রিলক্ষণের স্বরূপ উপলব্ধি করে স্রোতাপন্ন হলেন।

সম্যক সম্বুদ্ধ উপনীত হন যেখানে, তাঁর প্রতি প্রসন্ন ও শ্রদ্ধা-প্রবণ দেবগণও তাঁকে করেন সেখানে অনুসরণ এবং তাঁর অমৃতবাণী শ্রবণ করেন অন্তরীক্ষে অবস্থান করে। আজ সর্দ্ধম-বৎসল দেবগণের সহিত দেবকন্যা শ্রীমাও হলেন উপনীতা। তাঁর পরিত্যক্ত বিকৃত, গলিত ও দূষিত-দেহ উপলক্ষ করে অনুত্তর-শাস্তা আজ যে বিরাগ-পূর্ণ বাণী শোনালেন, তা' মর্মস্পর্শ করলো শ্রীমা দেবকন্যার, পরমামৃতের আশ্বাদ পেলেন সেই অমূল্যবাণীতে। তাঁর অন্তরে জাগিয়ে দিলো সে' উপদেশ অত্যধিক বিরাগ ও সংবেগ। অনিত্য দুঃখ অনাত্মের প্রকৃত স্বরূপ চিন্তা করতে করতে তিনি প্রতিষ্ঠিত হলেন সঙ্কদাগামী ফলে,* [সঙ্কদাগামীর কামরাগ ও প্রতিঘ (ক্রোধ) এ দ্বিবিধ সংযোজন সূক্ষ্ম হয়, প্রগাঢ়ভাব বিদূরিত হয়। এত সূক্ষ্ম হয় যে- তা' আছে কি নেই উপলব্ধি হয় না ॥ উপনীত হলেন নির্বাণের দ্বিতীয় স্তরে।

[ধর্মপদার্থকথা, বিমানবথু অর্থকথা]

৷ চৌদ্দ ৷

এক সময় ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহের গৃধকূট পর্বতে অবস্থান করেছিলেন। তখন তাঁর পরমায়ু ৭২ বৎসরে উপনীত হয়েছিলো। এমতাবস্থায় তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ দেবদত্ত বদ্ধপরিকর হলেন তাঁকে হত্যা করার জন্য। সকল সময় তিনি বিচরণ করে থাকেন তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির সন্ধানে। একদিন সেই পাপ-বাসনা নিয়ে আরোহণ করলেন গৃধকূট পর্বতে। তখন মহামানব বুদ্ধ তথায় দুই পর্বতের মধ্যস্থলে, নিম্নতম প্রদেশে, সঙ্কীর্ণ সমতল পথে চংক্রমণ করেছিলেন। দেবদত্ত মনে করলেন-এ'ই উত্তম সুযোগ। একখানা বৃহত্তর শিলাখণ্ড তিনি ছেড়ে দিলেন সুগতকে লক্ষ্য করে। তা' ভীষণ গড় গড় শব্দে পড়তে লাগলো, দ্রুত নিম্ন হতে নিম্নতম প্রদেশে।

পুণ্যপুরুষ তথাগতের অনন্ত গুণের প্রভাবে এবং দেবগণের দৈব-শক্তিবলে দু'টি বৃহৎ প্রস্তরকূট উক্ত শিলাখণ্ডকে ধারণ করলো। দ্রুত পতনশীল শিলাখণ্ডের গতিরোধ হওয়ায়, পরস্পরের আঘাতে ক্ষুদ্র এক শিলাকণা সজোরে এসে সুগতের পাদদেশে করলো দারুণ আঘাত। সে' আঘাতে এক রক্তবিন্দুর স্ফোটক উৎপন্ন হলো তাঁর পায়ে। তীব্র বেদনার সঞ্চারণ হলো এতে। ভিক্ষুগণ তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে গেলেন 'মর্দকুক্ষি' * [এখানে অজাতশত্রুর মাতা রাণী বৈদেহী অজাতশত্রু মাতৃগর্ভে থাকা কালে গর্ভপাতের ইচ্ছার কুক্ষি (উদর) মর্দন করেছিলেন। তখন থেকেই এ স্থান 'মর্দকুক্ষি' নামে আখ্যাত হচ্ছে।] নামক স্থানে। তথা হতে জীবক আম্রকাননে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, সেখানে তাঁকে নিয়ে গেলেন ভিক্ষুগণ।

জীবক এ নিদারুণ সংবাদে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ উপনীত হলেন ভগবৎ সকাশে। তিনি অতি সত্ত্বর স্ফোটকে তীব্র ভেষজ প্রলেপ দিয়ে উত্তমরূপে বেঁধে দিলেন এবং বললেন-‘ভগবান, আমাকে এখন নগরে যেতে হচ্ছে, তথায় একজন রোগী আছে। তা' সেরে আবার এখানে আসবো। আমি না আসাবধি এ বাঁধন খুলবেন না।’ এ বলে তিনি চলে গেলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে অনেক পূর্বে। জীবক ফিরে এসে দেখলেন, বিহারের বহির্দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি প্রবেশ করতে না পেরে বিশেষ চিন্তিত ও অনুতপ্ত হলেন।

‘অহোঃ, আমি কি ভুলই করলাম, সাধারণ লোকের ব্যবহারযোগ্য তীক্ষ্ণ-ওষুধই ভগবানের কোমলাঙ্গে প্রলেপ দিয়েছি। এ সময় বন্ধন না খুললে, তাঁর শরীরে দাহ উৎপন্ন হয়ে কষ্ট পাবেন সারারাত।’ এ ভেবে জীবক খুব উৎকর্ষিত হলেন এবং অশান্তি অনুভব করলেন। সে’ সময়েই দিব্যদর্শী বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে আদেশ করলেন-‘আনন্দ, আমার পায়ের বন্ধন খুলে দাও।’ স্থবির বন্ধন খুলে দেখলেন-স্ফোটক অন্তর্হিত হয়েছে, আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই।

জীবক অতি প্রত্যাষে উদ্বিগ্ন চিত্তে দ্রুত এসে সুগতকে বন্দনা করে জিজ্ঞাসা করলেন-‘ভগবান, আপনি কেমন আছেন? শরীরে কি দাহ অনুভব করছেন?’

তথাগত প্রসন্ন-মুখে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করলেন-

‘গতদ্ধিনো বিসোকস্স বিপ্পমুত্তস্স সৰ্ব্বাধি,
সৰ্ব্বগহুপ্পহীনস্স পরিলাহো ন বিজ্জতি।’

জীবক, বোধিতরুমূলেই তথাগতের সর্বদাহ উপশম হয়ে গেছে। অর্হৎ, শোকহীন, তৃষ্ণা-বিমুক্ত ও সংসার-বন্ধন ছেদনকারীর (অন্তরের) দাহ বিদ্যমান থাকে না।’

জীবক সানন্দে বুদ্ধবাণী সমর্থন করলেন।

(ধর্মপদার্থকথা)

॥ পনের ॥

অজাতশত্রু মগধরাজ বিম্বিসারের জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁর সতের বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতা তাঁকে অধিকারী করলেন রাজসিংহাসনের। তিনি রাজা হলেন সমগ্র মগধের। তবুও পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করলেন তিনি নৃশংসভাবে উৎকট ধূমাগারে অনাহারে রেখে, পদতল খুরাঘাতে জর্জরিত করিয়ে, কাটা-ঘায়ে লবণ দিয়ে জ্বলন্ত খদিরাস্থারে তণ্ডু করে। যদিও বা বিম্বিসার স্রোতাপন্ন আর্যশ্রাবক, কর্মের বিধান কিন্তু এড়াতে পারলেন না। এর ইন্ধন যুগিয়ে ছিলেন দেবদত্ত।

পিতৃহত্যা করে অজাতশত্রু হলেন নিরতিশয় অনুতপ্ত, শোকাহত, সন্ত্রস্ত ও বিভীষিকাগ্রস্ত। নিদ্রার সময় স্বপ্নে দেখেন ভীতিব্যঞ্জক দৃশ্যাবলী-শত শত তীক্ষ্ণ-শেল যেন বিদ্ধ হয় তাঁর বক্ষে; ভীতি ত্রাসে নিদ্রা ভেঙে যায়, কম্পিত-কলেবরে তখন শয্যা ছেড়ে উঠে পড়েন। এ'কারণে তিনি যাপন করতে লাগলেন বিন্দ্র-রজনী তাঁর এই দুর্নিবার দুঃখের সময়ে জীবকের সাহচর্যে ও সদুপদেশে ভগবান বুদ্ধের সংস্পর্শে এসে লাভ করেছিলেন তিনি নবজীবন, বিদূরিত হলো ভয় ও বিভীষিকা। পিতৃহত্যার পর থেকে তিনি আকুল হয়ে পড়লেন দুঃখহারী মহামানব বুদ্ধের দর্শনেচ্ছায়। কিন্তু তাঁর নিকট তো তিনি মহাপরাধী। তিনিই বুদ্ধকে হত্যার জন্য দেবদত্তকে করেছিলেন সাহায্য। আর্যবিধান মতে বিম্বিসার বুদ্ধপুত্র, তাঁকে হত্যা করেছেন নিষ্ঠুরভাবে এবং যে' পিতা তাঁর পক্ষে মৈত্রী-করুণা, মুদিতা উপেক্ষার মূর্তপ্রতীক, সেই ব্রহ্মসদৃশ আদিগুরু পিতাকে করেছেন হত্যা। আর্য-বিনয়মতে এসব অখণ্ডনীয় মহাপরাধ। তাই তিনি সাহস করতে পারছেন না, সুগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য।

এক শারদীয় পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। অমাত্যগণ পরিবৃত হয়ে উপবিষ্ট হয়েছেন রাজা অজাতশত্রু। তাঁর ইচ্ছা, আজ বিন্দ্র রজনী অতিবাহিত করবেন। কারণ বিভীষিকাপূর্ণ নিদ্রার প্রতি তাঁর বড় ভয়। অজাতশত্রু স্বগত বলে উঠলেন-‘আহা, কী সুখদা জ্যোৎস্নাময়ী-রজনী! এমন প্রীতিদায়িনী শুক্লারজনীতে চিত্তপ্রসাদ লাভ করাই একান্ত প্রয়োজন। এখন কোন উপদেষ্টার নিকট যাবো, যাঁর অমৃতোপম

ধর্মোপদেশে প্রাণে শান্তি পাবো, আনন্দ লাভ করবো?

রাজার আবেগপূর্ণ কথা শুনে অমাত্যদের এক একজন আসন ছেড়ে উঠে সোৎসাহে বর্ণনা করলেন তাঁদের কুলগুরুগণের গুণাবলী। যথা-পূরণ কস্‌সপ, মক্‌খলী গোসাল, অজিত কেসকম্বল, পকুধ কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্ঠপুত্ত ও নিগঠ্ঠনাতপুত্ত।

অজাতশত্রুর অনতিদূরে নীরবে উপবিষ্ট ছিলেন জীবক। তিনি স্রোতাপন্ন আর্যশ্রাবক। ভগবান বুদ্ধের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। অজাতশত্রু চিন্তা করলেন-‘আমি একমাত্র শুনতে চাই জীবকের বক্তব্য। কিন্তু, তিনি তো কিছুই বলছেন না। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা না করলে, বলবেন না মনে হয়।’ এ চিন্তা করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন-‘সচিবপ্রবর জীবক, আপনি নীরব কেন? আপনার কি কোনও কুলগুরু নেই?

এবার জীবক আসন ত্যাগ করে উঠলেন এবং সম্যক্‌ সম্মুখের উদ্দেশ্যে বন্দনা করে বিহারাভি মুখে কৃতাজ্জলি হয়ে বললেন-‘মহারাজ, আমার গুরু আছেন, তিনি সাধারণ নন। জগতে যিনি মহামানব, আশ্চর্য পুরুষ, তিনিই আমার গুরু। যাঁর মাতৃগর্ভে উৎপত্তি, ভূমিষ্ঠ, অভিনিষ্ক্রমণ (সংসার ত্যাগ), সম্বোধি লাভ ও ধর্মচক্র প্রবর্তন সময়ে প্রকম্পিত হয়েছিলো এ মহাপৃথিবী, তথা দশসহস্র চক্রবাল; আমি সেই তথাগতের উপাসক। যাঁর এরূপ কীর্তিকলাপ জগতে বিঘোষিত হচ্ছে-অর্হং, সম্যকসম্মুদ্ব, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষ-দম্য সারথি, দেব-মানবের শাসনকর্তা, বুদ্ধ ও ভগবান, সেই অনন্ত গুণ-সাগর অমিতাভের উপাসক আমি। যিনি দ্বাত্রিংশং মহাপুরুষ-লক্ষণ-সমলঙ্কৃত, পুণ্য-চিহ্ন অশীতি অনুব্যঞ্জন-পরিশোভিত, সমগ্র বসুধা, তথা কোটিশত সহস্র চক্রবাল যাঁর মহিমা-প্রভাবে চমৎকার আলোকোন্ডাসিত হয়, আমি সেই আলোকসামান্য ভগবান বুদ্ধের উপাসক। মহারাজ সেই অনন্যসাধারণ সম্যকসম্মুদ্ব সার্থ দ্বাদশ শত শিষ্যসহ অবস্থান করেছেন আমার আম্রকানন-বিহারে। আপনি সেই অদ্বিতীয় শাস্তার অমৃত-বাণী শ্রবণ করুন। নিশ্চয়ই আপনার ভয় বিদূরিত হবে, প্রাণে পাবেন শান্তি, তৃপ্ত হবে আকাঙ্ক্ষা।’

জীবকের উচ্ছ্বাসময়ী বাণী শ্রবণে নৃপতি অতিশয় আনন্দিত হলেন।

জীবককে বললেন-‘সৌম্য জীবক, তথাগতের নিকটই যাবো। যান-বাহনাদি সজ্জিত করা হোক।’

তীক্ষ্ণবুদ্ধি জীবক চিন্তা করলেন-‘রাজা এ নিশাযোগেই ভগবানকে দর্শন-মানসে যেতে ইচ্ছা করেছেন আম্রবন বিহারে। গমনকালে তাঁর কোনও বিঘ্ন-বিপদ যেন না ঘটে, তাই করতে হবে। রাজার চারপাশে রেখে দেবো পঞ্চশত অসি-ধারিণী রমণী। এদের থেকে রাজার কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা নেই।’ এ চিন্তা করে যথোচিত আয়োজন সম্পন্ন করলেন যথাসত্বর। নৃপতিকে জানালে তিনি এসে আরোহণ করলেন সজ্জিত মঙ্গল-হস্তীতে। পুরুষবেশে হস্তী-আরোহিণী পঞ্চশত রমণী এসে পরিবেষ্টন করলেন রাজাকে। নরেন্দ্রকে জানিয়ে দিলেন জীবক তাঁর চতুঃপার্শ্বের অবলাদের কথা। রাজা আশ্চর্য হয়ে জীবককে প্রশংসা করলেন। তারপর অনুক্রমে অমাত্যগণ, অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ সৈন্যগণ, রণবাদ্যবাদক ও মশালধারিগণ যথা-শৃঙ্খলায় স্থিত হলো। এ সময়ে জীবক সকলকে সাবধান করলেন-‘ভগবান বুদ্ধ বিবেক প্রিয়। কোনরূপ উচ্চশব্দ-মহাশব্দ যেন না হয়।’ এ বলে সকলকে অগ্রসর হতে বললেন আম্রবনাভিমুখে। ‘রাজার উপর যদি কোনও বিপদ উপস্থিত হয়, তাঁর জন্য জীবন দান করবো সর্বপ্রথম আমিই।’ এ মনে করে তিনি রইলেন রাজার অনতিদূরে।

গিরিশ্রেণীর পার্শ্বদিয়ে, বনরাজির মধ্যপথে নীরবে চলতে লাগলো রাজপরিষদ। আম্রবনের অনতিদূরে পৌঁছলে অজাতশত্রুর অন্তরে হলো ভয়ের সঞ্চারণ। রাজা মাত্রই শব্দে অভিরমিত হন। রাজ পরিষদের কারো মুখে শব্দ নেই, তথা আম্রকাননেও। চতুর্দিক নীরব-নিথর। রাজা অতি উৎকণ্ঠিত হলেন। জীবকের প্রতি হলো সন্দেহের সঞ্চারণ। ‘জীবক নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধি পোষণ করেছে। আমায় এখানে এনেছে প্রবঞ্চনা করে। এ আম্রবনে যদি অবস্থান করেন সাড়ে বারশত ভিক্ষু, তবে তাঁদের সামান্য একটু সাড়া শব্দও পাওয়া যাবে না কেন? সে হয়তো সম্মুখে শত্রুসৈন্য রেখে দিয়ে কৌশলে আমায় নগর-বের করেছে। নিশ্চয়ই সে এ ইচ্ছা পোষণ করেছে-আমায় হত্যা করে সে রাজা হবে। জীবক পাঁচ হাতির বল ধারণ করে, আবার সে রয়েছে

আমার অনতিদূরে; অথচ, অস্ত্রধারী একজন পুরুষও নেই আমার নিকট, সবই অবলা আমার চার পাশে, ইহা কি তার শঠতা নয়!' এ মনে করে তিনি জীবককে জিজ্ঞাসা করলেন-‘বন্ধু জীবক, আপনি আমায় প্রবঞ্চনা করেন নি তো? আমায় শত্রুহাতে সঁপে দেবেন না তো? বলেছিলেন-সাড়ে বারশত ভিক্ষু আপনার আম্রবনে অবস্থান করেছেন, এতগুলো ভিক্ষু যেখানে, সেখানে কিরূপে একটা হাঁচি, একটা কাশি, অথবা সামান্যটুকু আলাপ শব্দও না হবে, তাও কি সম্ভব?

রাজার এরূপ ভীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে জীবক চিন্তা করলেন- ‘আশ্চর্য, রাজা আমায় সন্দেহ করেছেন, ভীত হচ্ছেন প্রাণভয়ে! তিনি তো জানেন না, আমি স্রোতাপন্ন, প্রাণী হত্যা করি না।’ এ চিন্তা করে তিনি আশ্বাস-বাক্যে বললেন-‘মহারাজ, আপনার সন্দেহ অমূলক। আমার জীবনের জন্যও আপনাকে সঁপেদিতে পারি না শত্রুহাতে, করতে পারি না প্রবঞ্চনা। মৈত্রী-করুণার মূর্তপ্রতীক ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা সেরূপ নয়। অগ্রসর হোন মহারাজ, অগ্রসর হোন; ওই যে প্রদীপ জ্বলছে মণ্ডপে, শত্রু কি কখনও প্রদীপ জ্বলে বসে থাকে? যে’ দিকে প্রদীপ দেখছেন, সে’দিকেই অগ্রসর হোন।’

জীবকের এরূপ দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক আশ্বাস-বাক্য শুনে রাজা সান্ত্বনা লাভ করলেন। এতক্ষণে বিদূরিত হলো জীবকের প্রতি সন্দেহ, মৃত্যুভয়ও হলো তিরোহিত। তাঁরা ক্রমশ গিয়ে উপনীত হলেন আম্রবনে। বিহার সীমার বহির্দ্বারে রাজা হস্তী হতে অবতরণ করলেন। ভূপৃষ্ঠে স্থিত হওয়া মাত্র মহামানব তথাগতের অলোক সামান্য পঞ্চতেজঃ * /শীলতেজঃ, গুণতেজঃ, প্রজ্ঞাতেজঃ, পুণ্যতেজঃ ও ধর্মতেজঃ ॥ তাঁর সর্বশরীরকে যেন তপ্ত করে তুললো এরূপই অনুভব করলেন। তখনি রাজার সর্বাঙ্গ হতে ঘর্ম নির্গত হয়ে আর্দ্র হয়ে গেলো পরিধেয় বস্ত্র। স্মৃতিপথে জাগ্রত হলো সমস্ত অপরাধ, তাই তাঁর অত্যধিক ভয়ের সঞ্চারণ হলো। সরাসরি ভগবানের নিকট উপস্থিত হতে তিনি সাহস করলেন না। জীবকের হস্ত-ধারণ করে ধীরে-মস্থরে পদচারণ করতে লাগলেন বিহার প্রাঙ্গণে। বিহারের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করলেন তিনি। বললেন সপ্রশংসবাক্যে-‘সৌম্য জীবক, চমৎকার হয়েছে আপনার

আম্রকানন বিহার। স্থানটাও খুব নির্জন ও শান্তিপূর্ণ।' এরূপ গুণ-কীর্তন করতে করতে অনুক্রমে এসে ধর্ম-মণ্ডপের দ্বার-সন্নিধানে উপনীত হলেন। তখন মণ্ডপে উপবিষ্ট ছিলেন ভিক্ষুগণ-পরিবৃত ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ। সকলেই শান্ত-দান্ত ও চিত্তবিমুক্ত। নয়ন-তৃপ্তিকর সুগতের ষড়রশ্মি আলোকময় করেছিলো বিহার-সীমা। নৃপতি সুগতকে পরিজ্ঞাত হয়েও রাজকুলের ঐশ্বর্য্য-লীলায় জীবককে জিজ্ঞাসা করলেন'-বন্ধু জীবক, ভগবান কোথায়?'

রাজার কথা শুনে জীবক আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করলেন-'রাজা বলেন কি! যেমন পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থিত হয়ে-'কোথা পৃথিবী?' দিবাকর প্রভাসিত নভোমণ্ডল অবলোকন করে-'কোথা দিবাকর?' বলে জিজ্ঞাসা করার মতো, আমাদের রাজাও তেমন ভগবানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে 'কোথা ভগবান?' জিজ্ঞাসা করছেন! ভগবানকে ভালোরূপে দেখিয়ে দিতে হবে।' এ চিন্তা করে তিনি যদিকে উপবিষ্ট আছেন সম্বুদ্ধ, সেদিকে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন-'নরনাথ, অই যে পুণ্যপুরুষ ভগবান ভিক্ষুগণের সম্মুখে, যিনি মধ্য-স্তুম্ভ অবলম্বন করে পূর্বমুখী হয়ে বসে আছেন, যাঁর শরীর দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ-লক্ষণ, অশীতি অনুব্যঞ্জন পরিশোভিত, যাঁর দেহ থেকে বিকাশিত হচ্ছে ষড়রশ্মি, তিনিই ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ।' জীবকের ভাষণ শেষ হলে, রাজা অজাতশত্রু যন্ত্র-চালিতের ন্যায় বিনম্রভাবে ধীরপদ-সঞ্চালনে ভগবৎ সকাশে উপনীত হলেন। বন্দনান্তে তিনি প্রশ্ন করলেন 'শ্রামণ্যফল' সম্বন্ধে। শাস্তা উপমা-যুক্তি সহকারে দেখালেন প্রত্যক্ষ শ্রামণ্যফল কিরূপ। রাজা অশ্রুতপূর্ব প্রত্যক্ষ শ্রামণ্যফল সম্বন্ধে শুনে চমৎকৃত হলেন। তিনি প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে সম্বুদ্ধের প্রশংসা কীর্তন করলেন এবং ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হলেন। অতঃপর তথাগতের পদপ্রান্তে মস্তক রেখে সমস্ত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ক্ষমার প্রতীক বুদ্ধ তাঁর অপরাধ ক্ষমা করলেন। অতঃপর নৃপতি মুনিশ্রেষ্ঠকে বন্দনান্তে বিদায় নিয়ে জীবকের হস্তধারণ করে প্রীতমনে প্রস্থান করলেন। সেদিন থেকে রাজার ভয়, অশান্তি ও বিভীষিকা-দর্শন সবই অন্তর্হিত হলো। জীবক অজাতশত্রুর মহদুপকার সাধন করলেন।

(দীঃ নিঃ শ্রামণ্যফল সূত্র)

পরিশিষ্ট

জীবকের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছিলো-তঁার মধুর আলাপে, সাধু-চরিত্রে, ধর্ম-নিষ্ঠায়, পরোপকারিতায়, চিকিৎসা নিপুণতায়, রোগ-নির্ণয়ে বিচক্ষণতায়, রোগারোগ্যের আশাতীত সফলতায় ও বিচার বুদ্ধির প্রখরতায়। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে সকলেরই তিনি ছিলেন প্রীতিপাত্র, সকলেই তঁার নিকট উপকৃত। উৎকট-দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির সহসা রোগমুক্ত হয়ে জীবককে মনে করতো জীবনদাতা পিতা সদৃশ। দরিদ্রেরা তঁার দয়ায় বিনা অর্থে রোগমুক্ত হয়ে তাঁকে করতো আন্তরিক শ্রদ্ধা। বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের একমাত্র চিকিৎসক ছিলেন ভিষকশ্রেষ্ঠ জীবক। তঁার জীবন ধন্য; যেহেতু, জগদ্ব্যাধি প্রমোচক মহামানব বুদ্ধকে তিনি-ব্যাধিমুক্ত করেছিলেন। তাঁকে ‘অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন তঁার গুণমুগ্ধ মগধবাসী। তিনিও সকলের সন্তোষ বর্ধনে যত্নপর থাকতেন।

একদা তথাগত বুদ্ধ এক ধর্মসভায় ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা সম্মিলিত মহাপরিষদে ওজস্বিনী ভাষায় দেশনা করেছিলেন-দান, শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার নিগূঢ়-তত্ত্ব। অভিনিবেশ সহকারে শুনছেন জনগণ সম্মুদ্বের অমৃত-নিস্যন্দিনী বাণী। শুনে সকলেই হলেন উৎসাহিত, উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত। হৃদয়ে জাগলো পুলক শিহরণ।

কথাপ্রসঙ্গে পরমার্থ-মানবের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জীবকের মহিমাব্যঞ্জক সদগুণাবলীর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো মহামানবের কন্মুকঠ। ‘জীবক অতি বিচক্ষণ, জ্ঞানবান, শিব সুন্দরের একনিষ্ঠ উপাসক, স্রোতাপন্ন, আর্য়শ্রাবক, সততা, উদারতা, অমায়িকতা, ধর্মপ্রাণতা, ত্যাগশীলতা, জনপ্রিয়তা, পরোপকারিতাদি বহু গরিষ্ঠাবদানে সমলঙ্কৃত। জনগণ তঁার প্রতি হৃষ্ট, প্রীত, প্রসন্ন। তিনিও ছিলেন সতত আবালবৃদ্ধবণিতার সন্তোষ সাধনে যত্নশীল। আমার গৃহী শ্রাবকদের মধ্যে জীবকই একমাত্র সর্বসাধারণের সন্তোষ বর্ধনকারীদের অগ্রগণ্য।’ এতদূর বলে মুনিপুঙ্গব বুদ্ধ পরিসমাপ্ত করলেন দেশনা।

মহাপরিষদের ‘সাধু সাধু’ হর্ষ-ধ্বনিতে সভাস্থল হলো মুখরিত। ‘জীবকের জীবন ধন্য, একান্তই তিনি পুণ্যবান ও ভাগ্যবান। সম্যক সম্মুদ্বের প্রশংসা ও উপাধি লাভ করা যেমন-তেমন কথা নয়, বহু

সুকৃতির প্রয়োজন।’ এ বলে জনগণ তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন শতমুখে।

সুচিরবাঞ্ছিত ও প্রার্থিত তথাগত-প্রদত্ত গৌরবময় অভিধায় বিভূষিত হয়ে জীবক আজ নিজেকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করলেন। এ তাঁর স্বেপার্জিত মহান কর্মের অপূর্ব ফল, পূর্বজন্মের প্রার্থিত বিষয়।

পূর্বজন্ম-লক্ষকল্প পূর্বে ভগবান পদুমোত্তর বুদ্ধ যখন জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন হংসবতী নগরে কোনো এক মধ্যবিত্তের পুত্ররূপে জন্ম নিয়েছিলেন বর্তমানের এই জীবক। তিনি ছিলেন অতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন ও ধর্মপ্রাণ। একদিন তিনি ধর্মশ্রবণ করতে গিয়ে দেখলেন তথাগত বুদ্ধ জনৈক খ্যাতনামা ভিক্ষকশ্রেষ্ঠকে বিভূষিত করলেন এ উপাধিতে-‘সর্বসাধারণের সন্তোষ বর্ধনকারীদের অগ্র’। তা’ দেখে উক্ত সজ্জন চিন্তা করলেন-‘আহা, কী ভাগ্যবান পুরুষ! বুদ্ধের প্রশংসা লাভ করা তো সহজ ব্যাপার নয়; নিশ্চয়ই ইনি মহাপুণ্যবান। আমি কি হতে পারবো এমন সৌভাগ্যের অধিকারী? হতে পারবো কি এককালে ঐ ন্যায় ভিক্ষকশ্রেষ্ঠ? আমার ভাগ্যে ঘটবে কি, আপামর সর্বসাধারণের সন্তোষ বিধান করে কোনও এক সম্মুদ্বের প্রশংসা লাভ করা? আমাকে নিশ্চয়ই অধিকারী হতে হবে- এমন অভিধামণ্ডিত গরিষ্ঠ অবদানের।’ এ চিন্তার পর তিনি শিষ্য পদুমোত্তর বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করলেন সপ্তাহ কালের জন্য। সপ্তাহ যাবৎ চলতে লাগলো দানযজ্ঞ ও ধর্ম-শ্রবণ। সপ্তমদিন তিনি পদুমোত্তর বুদ্ধের পাদপদ্মে মস্তক রেখে প্রার্থনা করলেন-‘ভগবন্, সেদিন আপনি রাজবৈদ্যকে ‘সর্বসাধারণের সন্তোষ বর্ধনকারীর অগ্র’ এ উপাধিতে করলেন বিভূষিত। প্রভো, আমিও হতে চাই সে’পদের অধিকারী। আজ সপ্তাহ যাবৎ যেই পুণ্য-সম্পদ লাভ করেছি, তা যেন এই গরিষ্ঠপদের হেতু হয়, বীজ হয়। এ পুণ্যময়-বীজ একদিন মহীরুহে রূপায়িত হয়ে যেন আমার প্রার্থনানুরূপ মহীয়ান ফল প্রসব করে। ভগবৎ সদৃশ কোনও এক সম্মুদ্বের উপাসক হয়ে ভিক্ষকশ্রেষ্ঠ হতে পারি এবং যেন জনসাধারণের সন্তোষ বর্ধনকারীদের শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারি, ভবদীয় সমীপে এটাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।’

বিদ্যদর্শী পদুমোত্তর বুদ্ধের দিব্যনেত্রের গোচরীভূত হলো এই সজ্জনের ভবিষ্যৎ। তিনি প্রকাশ করলেন মধুরকণ্ঠে-‘উপাসক, লক্ষকল্প পরে

জগতে আবির্ভূত হবেন গৌতম বুদ্ধ। তাঁর ধর্ম-প্রবর্তন সময়ে ফলবতী হবে তোমার প্রার্থনা।’

এই উন্নতমনাঃ সৎপুরুষই কুশলকর্মে নিজকে নিয়োজিত রেখে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছেন জন্ম-জন্মান্তর অতিক্রম করে। পরিশেষে গৌতম বুদ্ধের সময়ে সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছিলো তাঁর প্রার্থনা। হয়েছিলেন ভিক্ষকশ্রেষ্ঠ, সাধন করেছিলেন জগতের মহাকল্যাণ। তথাগত বুদ্ধ তাঁর যোগ্য দাবির অধিকারী করেছিলেন তাঁকে, বিভূষিত করেছিলেন তাঁকে তাঁর প্রাৰ্থনানুযায়ী গৌরবময় অভিধায়। পুণ্যশ্লোক জীবক অস্তিম-জীবন অতিবাহিত করেছিলেন স্রোতাপন্নের প্রতিপাদ্য বিষয়ে নিজকে সমাহিত রেখে, নীরোগ ও অটুট স্বাস্থ্য-সুখে, ফল-জ্ঞান ও ত্রিবিধ সংযোজন-মুক্তির অনাবিল আনন্দে। পরিশেষে তিনি মানবদেহে ত্যাগ করে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন দেবলোকে। সপ্তম জন্মে হবেন তৃষ্ণামুক্ত, সাক্ষাৎ করবেন অমৃত নির্ঝর নির্বাণ।

* * * * *

অজাতশত্রু পিতা বিশ্বিসারকে নৃশংসরূপে হত্যা করায় অভয়কুমার হলেন অত্যধিক মর্মান্বিত ও সংবেগপ্রাপ্ত। শোকাহত অন্তর হলো সন্তপ্ত ও সংক্ষুব্ধ, সংসারের প্রতি হলো বীতস্পৃহ, তিনি গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন সম্বুদ্ধ-শাসনে। অচিরেই তৃষ্ণাক্ষয় করলেন তিনি। অর্হৎ হয়ে ভবদুঃখের করলেন অবসান। তিনি অভয় স্থবির নামেই পরিচিত হলেন সর্বত্র।

একদা জননী পদ্মাবতী-সন্নিধানে উপনীত হলেন অভয় স্থবির। শোনালেন দ্বাত্রিংশাকার-শরীর-তত্ত্বের বিশ্লেষণ। শুনে তিনি উপলব্ধি করলেন নশ্বর দেহের যথার্থ স্বরূপ। ধিক্কার উপস্থিত হলো স্বকীয় পঙ্কিল-জীবনের প্রতি। উৎকণ্ঠিত হলেন সংসার-নিগড় থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছায়। পুত্রকে জানালেন তাঁর মনোভাব। তিনি উপদেশ দিলেন বুদ্ধের শরণাপন্ন হতে, ভিক্ষুণী-ধর্মে দীক্ষা নিতে। কাজ করলেন পুত্রের নির্দেশ মতো। ভিক্ষুণী হলেন পদ্মাবতী। মন সংযোগ করলেন বিদর্শন ভাবনায়। অচিরে ছিন্ন করলেন তৃষ্ণাজাল, চিত্ত হলো বিমুক্ত। অর্হৎ হলেন পদ্মাবতী।

(সমাপ্ত)

প্রকাশক পরিচিতি



ধর্মানুরাগ-ধর্মচেতনা মানুষের জীবন প্রবাহকে সতত সৃষ্টিমুখর করে তোলে-তাকে ডেকে নিয়ে যায় সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। কালক্রমে পূত চিত্তের ধারক বাহক সে যশস্বীজন সবার শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় হয় আপ্ত। ধর্মনির্যাস প্রজ্ঞায় তার জীবন হয়ে ওঠে অতুলনীয় সৌন্দর্যের আধার।

অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী পংকজ বড়ুয়া তেমনি একজন ধর্মে কর্মে পুণ্যস্নাত সফল ব্যক্তিত্ব। তার জন্ম জনপদ চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানার মছদিয়া গ্রাম। তার পিতা স্বর্গীয় নীর রতন বড়ুয়া মাতা ললু বালা বড়ুয়া।

আশৈশব ধর্মানুরাগী পংকজ বড়ুয়ার জীবনের কিছু সময় অষ্টম সংঘরাজ প্রয়াত শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবিরের দুর্লভ সান্নিধ্যে কাটানোর সুযোগ হয়েছিল। ধর্মীয় চেতনার মহা উন্মোচনার্থে তার যে নূতন জীবনায়ন যাত্রা শুরু হয়েছিল তা আজও এক দীর্ঘসময় পরেও অবিচল থেকেছে। তারই ফলশ্রুতিতে তিনি মন প্রাণে সদ্ধর্ম বিকাশ সুপ্রকাশে আজো সপ্রতিভ কর্মমুখর।

বৌদ্ধধর্মের সৌন্দর্য সুধা প্রকাশ বিকাশে তথা ধর্মীয় গ্রন্থাদি মুদ্রণ পুনঃমুদ্রণকে তিনি তার ধর্মচেতনার প্রকাশের ব্রত হিসেবে নিয়েছেন। অষ্টম সংঘরাজ প্রয়াত শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবিরের মূল্যবান গ্রন্থ ‘জীবক’ পুনঃমুদ্রণে তার ঐকান্তিকতায় এর যথার্থ সাক্ষ্য মেলে।

‘জীবক’ গ্রন্থ পুনঃমুদ্রণে সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করে তিনি বৌদ্ধ জনসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন একথা নির্দিষ্ট বলা যায়। পংকজ বড়ুয়া শুধু ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ পৃষ্ঠপোষকতা নয়, বৌদ্ধ জনপদ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় নানা বিষয়ে নির্মোহ সাহায্য-সহযোগিতা-সহমর্মিতা প্রকাশ করে সমাজে ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন।

প্রজ্ঞাময় সৃষ্টিশীল মন-মানসের প্রতিভূ প্রচারবিমুখ স্নাতক ডিগ্রিধারী পংকজ বড়ুয়া প্রবাস জীবনে ব্যস্ত সময় কাটানোর পাশাপাশি সদ্ধর্ম প্রকাশ বিকাশে নিরন্তর প্রয়াস সমাজে অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে দ্যুতি ছড়িয়ে যাবে, আলোকিত করবে আমাদের বৌদ্ধ জনসমাজ মানসকে।